যদি সে ভালো না বাসে

মুহম্মদ জুবায়ের

নিশি

ডিমের ভাঙা কুসুমের মতো রং আজ সকালের। কতোদিন পর সূর্য উঠলো। যেন কোনোদিন সাক্ষাৎ হয়নি, এমন অপরিচিত লাগে। হিয়ার কাম্‌স্ দ্য সান! করমর্দন করে তাকে স্বাগত জানানো যেতে পারে, হাউ ডু ইউ ডু? পরিষ্কার নীল শরৎকালের আকাশ, আশপাশের গাছপালাগুলো ভেজা গায়ে রোদ খাচ্ছে।

কয়েকদিন টানা বৃষ্টি গেছে। আকাশ ছিলো গাঢ় ধূসর বর্ণের, বৃষ্টি থামেনি এক মুহূর্তের জন্যে। ইলশেগুঁড়ি, টাপুর-টুপুর, ঝিরিঝিরি, ঝমঝম ও ঝমাঝম – বাংলা বইয়ে যতো আছে, পালা করে সবরকম বৃষ্টি হলো এই ক'দিন। কীভাবে কে জানে, মেঘলা আকাশ মন খারাপের উপলক্ষ তৈরি করে দেয়। বৃষ্টি আমার এমনিতে খারাপ লাগে না, সব মৌসুমেই দিনে এক-আধ পশলা হলে ভালোই হয়। গভীর রাতের বৃষ্টি আমার সবচেয়ে প্রিয়, বাইরে বৃষ্টির শব্দ ছাড়া তখন আর কোনো শব্দ নেই। আমার নিশীথরাতের বাদলধারা। ঘুম ভেঙে কী যেন কী মনে হয়। ভুলে যাওয়া কোনো কথা মনে আসতে চায়, তবু আসে না। বুকের ভেতরে কী যেন এক অনুভব উঠে আসে, নিষ্কৃতি চায়। অল্প অল্প বেদনা ও বিষাদের ছায়া-অনুভব। এমন দুঃখ-দুঃখ সুখ আর কিছুতে নেই।

আমার ভালো লাগবে বলেই সব রাতে বৃষ্টি হয় না। দিনে এক-আধবার, তা-ও না। গত ক'দিনের মতো এরকম টানা বর্ষণে বিশুদ্ধ মন খারাপ, ভালো লাগার মিশেল একদম নেই।

কাল রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময়ও বাইরে টিপটিপ হচ্ছিলো শুনেছি। আজ জেগে উঠে এই সোনালি আলোর সকাল। আদুরে বেড়ালের বাচ্চার মতো নরম-নরম। এরকম রোদকে হয়তো রোদ্দুর বলা যায়। মন ভালো হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ডিমের ভাঙা কুসুমের কথা মনে এলো কেন জানি না। ডিম আমার দুই চক্ষের বিষ। দেখতে পারি না। ভাঙা ডিমের আস্ত কুসুমটুকু তবু দেখতে তেমন খারাপ লাগে না। কিন্তু ভাঙা কুসুমের হলুদের সঙ্গে স্বচ্ছ ট্যালটেলে বিবর্ণ অংশটা মিলেমিশে গেলে কী গা ঘিনঘিন! দেখলে বমি আসে। সেই জিনিস খাওয়ার জন্যে মায়ের প্রতিদিনের পীড়াপিড়ি, শরীর-গঠনে ডিমের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ। এড়ানোর জন্যে নাশতার টেবিলে একটা ছোটোখাটো যুদ্ধ লড়তে হয় আমাকে। বারো বছরের ঋষি কিন্তু দিব্যি তৃপ্তি নিয়ে খায়। আমার ভাগেরটা তার পাতে পাচার করে দিলেও আপত্তি করে না। ছেলে বলেই কি? হতে পারে।

বাবাও ডিম খুব ভালোবাসে, তা সে যে কোনো চেহারা নিয়ে টেবিলে আসুক – অমলেট, পোচ, ঝুরি ঝুরি, এমনকী হালুয়া রূপে হলেও। আজকাল বাবার প্রিয় ডিম তার খাদ্যতালিকা থেকে ছাঁটতে হয়েছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে, সপ্তাহে একটার বেশি কিছুতেই নয়। হাই কোলেস্টেরলের রোগীদের জন্যে বিষ। আমারও বিষ লাগে, তবু মা শুনবে না। বুঝবেও না। আচ্ছা, মানুষ ডাক্তারের বারণ বুঝতে পারে, কারো ভালো-লাগা মন্দ-লাগা বোঝে না কেন?

কাঁঠালবাগানের ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে ছয়তলা এই ভাড়া ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলায় আমরা আছি পাঁচ বছর। আমরা চারজন। দুই বেডরুমের ছোটো বাসা, তার একটা বাবা-মা'র। অন্যটায় আমি আর আমার ছয় বছরের ছোটো ঋষি। দুই ভাইবোন দুটি বিছানায়, পড়ার টেবিল ও আলনা ভাগাভাগি হয়। আগে অসুবিধা হতো না। ঘুমানোর সময় দু'জনে অনেকরাত পর্যন্ত বকবক করা যেতো। এখন দু'জনেই বড়ো হয়ে উঠছি, ঘর আলাদা হওয়া দরকার। পড়ার টেবিল পালা করে ব্যবহার করতে অসুবিধা হচ্ছে। আলনায় আমার কিছু পরিধেয় জিনিস এখন ঋষিকে আড়াল করে রাখতে হয়। ঘর আলাদা না হলে আর চলছে না। দেনদরবার করছি। মা বলেছে, হবে। বড়ো বাসায় গেলেই তোকে আলাদা ঘর দেবো।

একই কথা দুই বছর ধরে শুনছি। আরো কতোদিন শুনবো, কে জানে!

ব্যালকনি আছে এরকম একটা ঘর যদি আমার থাকতো! এই বাসায় ছোটো একটা ব্যালকনি আছে, বসার ঘরের সঙ্গে লাগানো। কেউ যায় না, সেখানে স্তূপ করা আছে ঘরে সবসময় লাগে না এইসব জিনিসপত্র। রোদবৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্যে বড়ো একটা পলিথিনে ঢাকা। ঋষির ছোটোবেলার তিন-চাকার সাইকেল পড়ে আছে একলা, পরিত্যক্ত। আর আছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা দুটো ফোল্ডিং চেয়ার। এমনিতে ব্যবহার হয় না, বাসায় বেশি লোকজন কখনো এলে চেয়ারগুলো ভেতরে আসার অধিকার পায়। সোফার পাশে পেতে বাড়তি বসার ব্যবস্থা। তা-ও আজকাল আর তেমন হয় না। কয়েক বছর আগেও বাবা ছুটির দিনগুলোতে বাসায় থাকতো, তার বন্ধুবান্ধবদের আনাগোনার শেষ ছিলো না। এখন কেউ আসে কালেভদ্রে। এই বাসায় উঠে আসার পর থেকে আমাদের জীবন অনেক বদলে গেছে। হয়তো বদলে গেছে বলেই আমাদের এখানে আসা।

সকালে নাশতা পর্যন্ত বাবার বাসায় থাকা, নয়টার মধ্যে বেরিয়ে যাওয়া, ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা। তখন তার হতক্লান্ত চোখমুখ দেখে ভারি মায়া লাগে। বাবা যখন ফেরে, তার মুখ থাকে বিষণ্ন ও চিন্তাক্লিষ্ট। এরকম দিন আমাদের ছিলো না, কয়েক বছরে কতোটা বদলে যেতে হলো বাবাকে। এই মানুষ ব্যালকনিতে যায় কখন, যাওয়ার কথা হয়তো মনেও আসে না।

মা বাইরে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, দরকার না পড়লে ব্যালকনিতেও যায় না। পর্দা করার ঝোঁক হয়েছে আজকাল, ধর্মকর্মে মন দিচ্ছে। বাইরে গেলে হেজাব পরে, তখন তাকে খুব অচেনা লাগে। মনে হয়, আমার মা নয়, অন্য কাউকে দেখছি। মাকে একসময় টিভিতে নজরুল আর লালনের গান গাইতে দেখেছি। ঋষিও দেখেছে খুব ছোটোবেলায়, ওর হয়তো মনে নেই। তখনকার উঠতি গায়িকা নীলাঞ্জনা সুলতানা কীভাবে যেন নেই হয়ে গেলো। কী সুন্দর সুর উঠতো গলায়। নিয়ম করে রেওয়াজে বসতো, এখন যেমন নামাজে বসে। আমি নিজেও মাঝেমধ্যে গলা মেলানোর জন্যে পাশে বসেছি। আমাকে গান শেখানোর শখ ছিলো তার, কিন্তু তা পূরণ করা আমার হলো না। সারেগামা শিখতেই ধৈর্য ফুরিয়ে যায়। বাক্সবন্দী হারমোনিয়াম পড়ে আছে মার ঘরে খাটের তলায়। গান-বাজনার কথা মা আর মুখে তোলে না, হয়তো শুনতেও চায় না।

একদিন মা নামাজ শেষ করে উঠেছে, তখন বললাম, তুমি না আমাকে গান শেখাতে চেয়েছিলে। ছোটোবেলায় ইচ্ছে করেনি, বুঝিওনি ভালো। এখন শেখাবে?

মা খর চোখে কতোক্ষণ তাকিয়ে থেকে বোধহয় আমার মতলব বোঝার চেষ্টা করলো। কী বুঝলো, বলা মুশকিল। তারপর আলগা গলায় বললো, তোর বাবাকে বলিস মাস্টার দেখতে।

বাবাকে বলতে হলে আমাকে বলতে হবে। মা বলবে না। তাদের দু'জনের মধ্যে কথা কম হয়, খুব দরকার না পড়লে একদম বন্ধ। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু বাসার ভেতরটা কেমন যেন গুমোট হয়ে থাকে টের পাওয়া যায়। বাবা-মা দু'জনেই বাসায় থাকলে ঋষি আর আমি নিজেদের ঘরের ভেতরে থাকি, গান শুনি। ঋষি টিভি দেখার জন্যে মাঝেমধ্যে বসার ঘরে যায়, আমি যাই না। কখনো-সখনো দু'চারদিন আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়, বাবা-মা দু'জনেই বেশ হাসিখুশি। আমরা দুই ভাইবোনও তখন তাদের সঙ্গে বসে গল্প করি। তখনো আমার ভয় ভয় করতে থাকে, এই বুঝি লেগে গেলো আবার। অনেক বছর ধরে তো এরকমই দেখে আসছি। হয়ও তাই, কোনো ব্যতিক্রম নেই।

সবসময় বোঝা যায় না, বুঝতে চাইও না, কী নিয়ে গলা চড়ে যায় তাদের। তারাও হয়তো বোঝে না, বুঝতে চায় না, আমরা দুই ভাইবোন কাছাকাছি আছি, শুনতে না চেয়েও সব শুনতে পাচ্ছি। আমরা তখন নিজেদের অদৃশ্য করতে দিতে পারলে, এই বাসার বাইরে কোথাও পালাতে পারলে বেঁচে যাই। এইসব চিৎকার-হল্লা চলে, যতোক্ষণ না বাবা উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে যায়। মা তখনো একা একা বাতাসের সঙ্গে, হয়তা কল্পনায় বাবাকে সামনে রেখে সরব থাকে। সব বাড়িতে কি এরকম হয়? জানি, হয় না। আমার নিজের জন্যে, ঋষির জন্যে মন খারাপ হয়। আমাদের বাবা-মা এরকম কেন? ভালো লাগে না।

মনে মনে মাকে বলি, তুমি বাবাকে বলো না কেন? মায়ের উত্তরও আমার জানা। বলবে, বাপসোহাগী মেয়ে, বাপের জন্যে তো জান দিয়ে দিস, তুই বল।

বাবার জন্যে আমার আলাদা টান আছে, অস্বীকার করি কী করে? অন্য কারো কাছে, মায়ের কাছে তো নয়ই, প্রকাশ করতে চাই না। তবু লুকিয়ে রাখা যায় না, কীভাবে যেন সবাই জেনে যায়। এমনকী, ঋষিও জানে। তবে কার দিকে তার পক্ষপাত, আমি এখন পর্যন্ত বুঝতে পারি না। এই দিক দিয়ে ও হয়তো আমার চেয়েও পরিপক্ক।

মনের কথা মনেই থাক। মুখে বলি, আমি তোমার কাছে আগে শিখে নিই, তারপর মাস্টার।

আমি তো গান ছেড়ে দিয়েছি।

ছাড়লে কেন মা? কী সুন্দর গলা তোমার।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

ব্যালকনিতে আমার যাওয়া নিষেধ। মা ঠিক মায়ের মতো বলে, ধাড়ি মেয়েকে এতো বাইরে যেতে হবে না। দেখিস না, পাড়ার ছেলেগুলো কেমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

কোথায় কী দেখে মা, কে জানে। মোটেই কেউ আমাদের ব্যালকনিতে তাকিয়ে বসে নেই, দূরবীণে চোখ লাগিয়েও কেউ দেখছে না। রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে একটা মেয়েকে কেউ চোখ তুলে দেখতেই পারে। তাতে কী দোষ হলো? আমিও তো বাইরে গেলে কোনো ছেলেকে লক্ষ্য করতে পারি। কী এসে যায়? মেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে থাকলে সব মা-ই মনে হয় এরকম বোকা বোকা কথা বলে, বানিয়ে বানিয়ে ভয় পায়। সোজাসাপটা পরিষ্কার চোখে দেখে না, সবকিছুতে শুধু দোষ খুঁজতে থাকে।

কোনো কারণে রেগে না থাকলে মায়ের সঙ্গে হালকা মজা করা যায়। মেজাজের সর্বশেষ খবর সবসময় রাখতে হয়, দৈনিক পত্রিকায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখার মতো। বিপদসংকেত ধরতে না পারলে পরিণতি খুবই খারাপ হয়। পরিষ্কার মেঘমুক্ত মন-টন দেখে একদিন বললাম, আমি তো কাউকে কোনোদিন এদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখি না। তুমি দেখো কেমন করে?

চোখ থাকলে ঠিকই দেখতে পাবি।

আমার কিন্তু মা মনে হয়, ওরা তোমাকেই দেখতে আসে। আমাকে দেখলে পালায়।

ফাজলামো হচ্ছে, না?

আসলে এই ব্যালকনিতে এখন আমার নিজেরও আর যেতে ইচ্ছে করে না। রাস্তার ওপারে ডোবাসহ ছোটো একটা ফাঁকা জায়গা ছিলো। সেসব ভরাট হয়ে গেছে, দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট উঠছে সেখানে। তিনতলা পর্যন্ত হয়ে গেছে, দিনভর খাটছে একদল ঘামে ভেজা মানুষ। নানারকমের ব্যস্ততা, হৈ চৈ, হাঁকডাক। ফাঁকা জায়গা কোথাও আর ফাঁকা থাকবে না মনে হয়। সামনে চোখ আটকে দেওয়া নির্মীয়মান দালানে দেখার কিছু নেই। তবু একা কখনো-সখনো গেলে ফোল্ডিং চেয়ার দুটো দেখে মন খারাপ হয়।

একদিন বিকেলে ইন্দিরা রোডে মিতালিদের বাসায় গিয়েছিলাম। স্কুল থেকে একসঙ্গে আমাদের ওঠাবসা। সন্ধ্যার আগে দেখি তার বাবা-মা ব্যালকনিতে বসেছে। হাতে চায়ের কাপ, চোখেমুখে আনন্দের দীপ্তি। কী কথা হচ্ছিলো জানি না, কিন্তু মুখ দেখেই মন ভরে যায়। মন খারাপও কি কম? আমার বাবা-মাকে এরকম কখনো দেখিনি। মায়ের কাছে শোনা, তারা নাকি দু'জনকে চিনেশুনেই পছন্দ করে বিয়ে করেছিলো। বাবার অবশ্য দ্বিতীয়বার।

রাতে ঘরের জানালা বন্ধ ছিলো, বৃষ্টির ছাঁট যাতে ঢুকতে না পারে। জানালা খুলে বাইরে সকালের রোদ দেখে ডিমের ভাঙা কুসুমের কথা কেন যে মনে এলো! সবার হয় কি না জানি না, আমি দেখেছি অনেক সময় অসম্ভব আজগুবি একেকটা কিছু যেগুলি মনের ভেতরে কোথায় লুকিয়ে ছিলো, আচমকা লাফিয়ে পড়ে সামনে। এমনকি অপছন্দের কিছু, যা ভাবতে চাই না, ইচ্ছেও করে না, সেইসব ভেবে বসি। কোথাও পড়েছিলাম, যা কিছু তোমার অপছন্দের, তা তুমি চাইলেও কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। কোথাও কোনোভাবে, চোখের আড়ালে হলেও, তারা আছে। দুই চোখ তুমি বন্ধ করে রাখতে পারো, ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এরকম রাস্তা এড়িয়ে ঘুরপথে যেতে পারো, তবু তুমি জানো কাছেই কোথাও তারা ওৎ পেতে আছে। সময়ে ঠিক এসে উপস্থিত হবে।

হয়তো তাই, মানলাম। কিন্তু যেসবে আমার ভালো লাগা, তা-ও চোখের সামনে না থাকলেও কোথাও আছে। আমার নাগালে না থাকতে পারে, তবু আছে তো। আমার পছন্দে সব হয় না, হবে না। যেমন ব্যালকনিসহ নিজস্ব একটা ঘর। হবে কি হবে না, জানা নেই। নিশুত রাতের বৃষ্টি, তা-ও হবে হঠাৎ হঠাৎ কখনো, আমার ইচ্ছায় নয়। বৃষ্টিভাঙা সকালে সোনা রঙের রোদ দেখে ডিমের ভাঙা কুসুমের উপমা মনে পড়বে, তা-ও আমার অনিচ্ছায়।

দিনটা কাটবে কী করে, এখন ভাবতে হবে। ইউনিভারসিটি বন্ধ, কবে খুলবে তার ঠিক নেই। মাঝেমধ্যেই কী সব গোলমালে এরকম ছুটি পাওয়া যায়। রোজা আসছে সামনে, এই ছুটিটা মনে হয় এমনিতেই রোজা পর্যন্ত গড়াবে। তাহলে ঈদের আগে আর ক্লাসে যাওয়া নেই। বৃষ্টিতে ক'দিন অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে ঘরবন্দী হয়ে থাকা হলো। বৃষ্টি মাথায় প্যাচপেচে কাদাপানি এড়িয়ে হাঁটো রিকশার জন্যে গ্রীন রোডের মোড় পর্যন্ত, তারপর রিকশায় বসে বৃষ্টির ছাঁট থেকে কাপড় সামলাও। কে যায়? ক্লাস থাকলে অবশ্য যেতেই হতো। নেই বলে বাইরে না গিয়ে বৃষ্টির দিনগুলো পার হলো। আজ কোথাও যাওয়া যায়? কী করা যায়? আপাতত হাতমুখ ধুয়ে খাওয়ার টেবিলে যেতে হবে।

মা সেদিন জিজ্ঞেস করছিলো, এবার আমি রোজা রাখবো কি না। এই বাসায় শুধু মা রোজা রাখে। আমি একদম পারি না, খিদে সহ্য হয় না, পাগল হয়ে যাই। এমনিতে হয়তো কখনো অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকা হয়ে যায়, কিন্তু ইচ্ছে হলেও সারাদিনে কিছু খেতে পারবো না ভাবলে পেটের মধ্যে সারাক্ষণ খিদে-খিদে। গ্যাস্ট্রিকের লক্ষণ আছে বলে ডাক্তারের নিষেধ, সেই নিষেধাজ্ঞা আমাকে রক্ষা করে। এবারও হয়তো করবে, মা কিছু বলতে পারবে না। না হলে রোজার দিনে আমার খাওয়া জুটতো কোথায়? মা ঋষিকেও রোজা করাতে চায়। বলে, এতো বড়ো ছেলে, নামাজ-রোজার নাম নেই, যাবি তো দোযখে।

বাবা তাকে রক্ষা করতে বলে, বারো বছরের বাচ্চারা দোযখে যায় না।

মা গজগজ করতে থাকে। বাবা-মায়ের সরাসরি কথা না বলাবলির সময়টা হয়তো ঋষির সমান বয়েসী, বা তার চেয়েও বেশি। মাঝেমধ্যে মা-বাবার মধ্যে কখনো হাসিঠাট্টা হতে দেখলে ভাবি, নকল নয় তো! নাকি অভিনয়! বহুদিনের অভ্যাসে সত্যি ও অভিনয়ের তফাৎ দেখতে পাই না। তবু ভাবি, সুসময়টা স্থায়ী হোক। প্রাণপণে চাই, হয় না।

মোবাইল বাজছে। এতো সকালে কে? জানালা থেকে সরে আসি। এসএমএস। মেসেজের রচয়িতা এবং প্রেরক ইরফান। লিখেছে, তোর ঘুম ভেঙেছে? না ভাঙলে সাতসকালে ঝাড়ি দিবি, তাই ভয়ে ভয়ে ফোন না করে এসএমএস বাবাকে পাঠিয়ে দিলাম। ঝাড়ি-নাশতায় আমার খুব অরুচি। জেগে থাকলে এক্ষুণি ফোন কর।

ঘড়িতে সাতটা চল্লিশ। ইরফানের এখন মাঝরাত হওয়ার কথা। রাতভর কমপিউটারে বসে থাকে, রাশি রাশি ইমেল, আইএম চ্যাট। পারেও। আর আছে তার সঙ্গীত রচনা। দেশের বাইরে কোথা থেকে একটা ইলেকট্রনিক কীবোর্ড আনিয়েছে, সেটা কমপিউটারে জুড়ে দিয়ে কম্পোজ করে। এই দুই যন্ত্র মিলে গীটার, ড্রাম, সিনথেসাইজার এইসব শব্দ প্রস্তুত করে, সঙ্গীতকারের কাজ সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করে ছাঁচে ফেলা, সুর তৈরি করা। এইসব কারিগরি সে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে সবিস্তারে বোঝানোর চেষ্টা করে। সব আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়, ধরতে পারি না। নিজের কয়েকটা কম্পোজিশন বন্ধুবান্ধব সবাইকে একদিন শুনিয়েছিলো। তার ঝিং-চাক যন্ত্রসঙ্গীত মন্দ লাগে না শুনতে।

তার মানে বান্দা রাতভর ঘুমায়নি। পাঁঠা একটা। ইরফান নাম বলে মেহরীন হঠাৎ তাকে ইরফান পাঠান ডাকতে শুরু করে। একদিন সাব্বির তাকে পাঠান থেকে পাঁঠায় রূপান্তরিত করে দেয়। অবিলম্বে তা গৃহীত ও প্রচলিত হয়ে গেলো সর্বসম্মতিক্রমে। ইরফান এইসব একদম গায়ে মাখে না। পাঠান বললে বলবি, পাঁঠা বললেও আপত্তি নেই, ইরফান তবু ইরফানই থেকে যাবে – এই তার ঘোষণা। এইরকম প্রবল আত্মবিশ্বাস তার। হওয়ার কথা অবশ্য। এতোসব নিয়ে যে দিনমান কাটায়, পড়াশোনা সে করে কখন? সুযোগ পেলে ক্লাসও ফাঁকি মারে। অথচ পরীক্ষায় বরাবর সবাইকে ছাড়িয়ে যায়।

আমার হঠাৎ রাগ হয়। এঃ, কে আমার এসে গেলেন, কোথাকার গোঁসাই। বললেন, এক্ষুণি ফোন করবি। আমি তোর হুকুমে চলি? আমাকে এখন হাতমুখ ধুয়ে খাওয়ার টেবিলে যেতে হবে। বাবা বসে থাকবে, মা তাড়া লাগাবে। কাজের লোকের অভাব আজকাল, মা একহাতে সব করে। আলাদা আলাদা সময়ে খেতে বসার নিয়ম এই বাসায় নেই। নাশতা সেরে তখন ইচ্ছে হলে ফোন করবো। ততোক্ষণ তুই বসে থাকবি, ঠিক আছে?

দাঁত ব্রাশ করে চোখেমুখে পানি দিতে দিতে বুঝি, আমি আসলে অতোটা শক্ত নই। যা করবো ভাবি, তা আঁকড়ে থেকে পালন করা হয়ে ওঠে না আমার। মাঝপথে এসে আগের সিদ্ধান্ত ভুলে যাই, পাল্টে ফেলি। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ফোন তুলে নিই। মা ডাকাডাকি করলে তখন দেখা যাবে।

একবার রিং হতেই ইরফানের গলা, মহারানীর ঘুম ভাঙলো?

মহারানী হলাম আবার কবে থেকে? এতোদিন তো ঘুঁটেকুড়ানি পেত্নী বলেছিস।

বলতে হয় তাই বলা। আমার কথায় তুই পেত্নীও হবি না, মহারানীও না। মেসেজ পেয়েছিলি?

না হলে তোকে এই সাতসকালে ফোন করতে যাবো কোন দুঃখে? তুই না মাঝে মঝে সত্যিই পাঁঠা হয়ে যাস।

হাঃ হাঃ করে গলা খুলে হাসে, পাঁঠার হাসিটা দরাজ। বলে, তোর মুখে পাঁঠা শুনলে আমার সবচেয়ে বেশি মজা লাগে।

আবার প্রমাণ দিলি। আমি কী এমন আলাদা? আর সবার মতোই তো বলি।

কী জানি, অন্যরকম শোনায়।

বুঝলাম। এখন বল, কেন ফোন করতে বলেছিস? সারারাত জেগে কী উদ্ধার করলি?

প্লুটোর সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কার সর্বনাশ হয়েছে বললি?

প্লুটোর। সৌরজগতের সেই সবচেয়ে ছোটো গ্রহটা।

তো তার কী হয়েছে?

তার জাত গেছে। এতোদিন সবাই জানে প্লুটো ন'টা গ্রহের একটা। এখন ইউরোপের বিজ্ঞানীরা বলছে, প্লুটো আসলে গ্রহ নয়। এদিকে আমেরিকার নাসা বলছে, তারা সেটা মানে না, প্লুটো এখনো গ্রহ।

আমার এখন মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা, হাত থেকে ফোন পড়ে যায় আর কি। একটু ছিটগ্রস্ত সে, আমরা সবাই জানি। এখন দেখছি সত্যি পাগল হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, তুই কি পাঁঠা থেকে পাগল হলি? সেটা প্রমোশন, না ডিমোশন?

মনে মনে ভাবা, বলা হয় না। বললেও তার কানে উঠতো, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এক নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে, যেন ঘোরগ্রস্ত। এইরকমই সে, যে বিষয়ে উৎসাহ তার শেষ দেখা চাই।

ইরফান বলে, ১৯৩০ সাল থেকে প্লুটো গ্রহ হিসেবে স্বীকৃত। ভাবতে পারিস ইউরোপীয়দের সিদ্ধান্ত টিকে গেলে আমাদের এতোদিনের জানা সৌরজগৎ পাল্টে যাবে? পৃথিবীর যাবতীয় পাঠ্য বই সংশোধন করতে হবে?

তাতে তোর কী ক্ষতি হবে?

ছোটোবেলা থেকে প্লুটো আমার সবচেয়ে প্রিয়, তা তো তুই জানিস না।

কেন, যে পৃথিবীর বাতাস খাচ্ছিস সে প্রিয় নয়? চাঁদই বা কী দোষ করলো?

তুই বুঝতে পারছিস না।

পাগলকে থামানো দরকার। বলি, ঠিক আছে। পরে বুঝিয়ে দিস। এখন মা ডাকছে, যেতে হবে।

আসলে মা ডাকেনি। প্রলাপ থামানোর জন্যে বানিয়ে না বলে উপায় ছিলো না। ফোন রেখে দিয়ে আমার খারাপ লাগতে থাকে। পাগল এই নিয়ে রাতভর ইন্টারনেট ঘেঁটেছে, আমি ঠিক জানি। সেই কথা কারো সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চায়। প্লুটো নিয়ে ওর এই আবেগে আমার কোনো অংশ নেই। তবু কী এমন হতো আরেকটু সময় দিলে? কতো অদরকারি কথা তো শুনি, না চাইলেও শুনতে হয়। ওগুলোতেই বা আমার কী প্রয়োজন?

একটু পরে ফোন করে পুষিয়ে দেবো ঠিক করি।

এতোক্ষণে আমার মাথায়ও ঘুরতে শুরু করেছে, প্লুটো আর গ্রহ নয়। ইরফানও পাঠান নয়, পাঁঠাও নয়, সে পাগল!

জামাল

টাকাপয়সা গুনে একটা পেটমোটা ব্যাগে ভরে রাখা আছে। টাকার অংকসহ ব্যাংকের ডিপোজিট স্লিপও তৈরি। টাকাগুলো ব্যাংকে জমা করে দেওয়া সকালের প্রথম কাজগুলোর মধ্যে একটা। দরকার নেই, তবু নিজে আরেকবার গুনি। আগের রাতের গোনাগুনতি সকালে মিলিয়ে নেওয়া। টাকাপয়সা জিনিসটাকে বিশ্বাস নেই, তা-ও আবার যদি একাধিক হাতে নাড়াচাড়া হয়ে থাকে।

গুলশানের এই নামী থাই রেস্টুরেন্টে ম্যানেজারের কাজ আমার। সকালে দশটার মধ্যে চলে আসি। কিচেনে শেফ ও তার সাহায্যকারীরা ন'টার মধ্যে এসে কাজ শুরু করে দেয়। দুপুরের আহারার্থীদের জন্যে প্রস্তুতি। রেস্টুরেন্ট খোলা থাকে সকাল এগারোটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। বন্ধ হওয়া পর্যন্ত আমাকে থাকতে হয় না, ন'টার পরে মালিকের ছেলে আসে সারাদিনের হিসেব-নিকেশ করতে। তখন সব বুঝিয়ে দিয়ে আমার ছুটি। কোনো কোনোদিন মালিক নিজে হঠাৎ এসে হাজির হয়, ভালোমন্দ সব খবর নেয়, কর্মচারীদের সবার সঙ্গে কথা বলে। সেদিন আমার বেরোতে দেরি হয়ে যায়। রেস্টুরেন্টের দরজা বন্ধ হলে আমার তৈরি করে রাখা পরদিনের বাজারের ফর্দটা দেখে নিয়ে মালিকের ছেলে তালা ঝুলিয়ে যায়। টাকাপয়সার হিসেব সেরে ব্যাগে ভরে রেখে যায়।

টাকাপয়সা নিয়ে সতর্কতার ফল একদিন পেয়েছিলাম। চাকরিতে তখন আমার মাসখানেক হয়েছে। একদিন সকালে গুনে দেখি, টাকার অংক মেলে না। ব্যাংকের স্লিপে যা লেখা, ব্যাগে তার চেয়ে দেড় হাজার টাকা বেশি। তিনবার গুনেও একই ফল। ফোন করি মালিকের ছেলেকে। ঘুমভাঙা গলায় ফোন ধরে সে জানায়, ব্যাংকের ডিপোজিট স্লিপটা ঠিক করে নিলেই হবে। সন্ধ্যায় মালিক নিজে আসে। তখন জানা যায়, ভুলটা তার নির্দেশেই করা হয়েছিলো। সততার পরীক্ষায় আমি পাশ, বেতন বাড়ার খবরও আমাকে জানানো হয়। তখন মনে পড়েছিলো, সকালে ফোনে মালিকের ছেলের গলায় কোনো বিস্ময়ের রেশ ছিলো না।

মালিককে বলা সম্ভব হয়নি যে, পরীক্ষা নেওয়ার দরকারই ছিলো না। এইসব ছোটোখাটো লোভের ফাঁদে আমাকে ফেলা যাবে না। আমি নির্লোভ মানুষ নই, সেরকম দাবি করার সাহস নেই। লোভ-টোভ আমারও ঠিকই আছে, ফেরেশতা নই। তবে এতো ছোটো অংকের টাকাপয়সায় আমার অরুচি।

টাকা গোনা তখনো শেষ হয়নি, টেবিলে রাখা মোবাইল ফোন সজাগ হয়। কোনো নম্বর দেখাচ্ছে না। কার ফোন, বোঝার উপায় নেই। তুলে হ্যালো বলি।

ওপার থেকে শোনা যায়, নিউ ইয়র্ক থেকে সাজিদ।

কী খবর রে, বাবা? তুই যে নিউ ইয়র্কে, তা কি আর জানি না?

সাজিদের হাসির শব্দ পাওয়া যায়। বলে, ঢাকা থেকেও তো করতে পারি।

তা পারিস, কিন্তু এলে তো জানতাম।

আমি কিন্তু বাবা আসছি ঢাকায়। সেই খবর দিতেই ফোন করা।

তাই? কবে?

মাসখানেকের মধ্যে চলে আসবো।

তুই একা? না তোর মায়ের সঙ্গে?

কেন, আমি একা আসতে পারি না? আমার বয়স এখন ঊনত্রিশ, বোধহয় তোমার মনেই থাকে না।

চুপ করে থাকি। মনে থাকা কঠিন বটে। কতো বছর দেখা নেই। ছেলেটা চোখের আড়ালেই বড়ো হয়ে উঠলো। চোখের দেখা না থাকলে মনের আর দোষ কি? বলি, তোর মা কেমন আছে?

বুদ্ধিমান ছেলে সে। প্রশ্নটা এড়িয়ে বলে, তুমি কেমন আছো?

আছি, চলে যাচ্ছে। তা বাপ, বললি তোর ঊনত্রিশ বছর বয়স, বিয়েশাদীর কথা ভাবতে হবে না?

ছেলের সঙ্গে বন্ধুর মতো একটা সম্পর্ক রাখা গেছে। হয়তো দূরের বলে। অথবা যে পরিবেশে সে বড়ো হয়েছে, তা-ও কারণ হতে পারে।

সাজিদ বলে, বিয়েতে আমার একটু ভয়ই লাগে।

কীরকম?

দেখছি তো তোমাদের। জিনিসটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

বুঝতে বুঝতে একদিন দেখবি বুড়ো হয়ে গেছিস।

তাতেই বা কী ক্ষতি হবে? সব বিয়ে তো তোমরাই করে ফেললে। দাদা, তুমি, মা, কস্তা।

রিনির বর রাশিয়ায় পড়াশোনা করেছে। সে দেশে বাবাকে কস্তা বলে, সে-ই শিখিয়েছে সাজিদকে। ভালোই করেছে। বাবা তো একজনই হয়।

নাজুক জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছে সাজিদ। প্রসঙ্গ পাল্টাতে হয়, আসার দিনতারিখ ঠিক করেছিস?

এখনো ঠিক হয়নি, তবে মাসখানেকের মধ্যেই।

কতোদিন থাকবি?

লম্বা সময়ের জন্যে আসছি। তেমন হলে থেকে যাবো।

মানে?

মানে কিছু নেই। বাংলাদেশটা কি আমার দেশ নয়? থেকে যেতেই পারি, যদি সুযোগ থাকে।

একটু অবাক হই। ছেলের জন্ম এ দেশে, তা ঠিক। এ দেশ ওর নিজের দেশ, তা-ও ভুল নয়। কিন্তু তার সত্যিকারের বেড়ে ওঠা আমেরিকায়, সেটাও তার দেশ। আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় রিনি ছেলেকে নিয়ে তার বাপের বাড়িতে উঠে যায়। বছর তিনেক পর তার আবার বিয়ে হয় আমেরিকাবাসী একজনের সঙ্গে। সালাম সাহেবেরও দ্বিতীয় বিয়ে, আগের পক্ষের এক মেয়ে আছে, সাজিদের সমবয়সী। শুনেছি ভালো আছে রিনি। সাজিদের সঙ্গে বরাবর যোগাযোগ রেখেছি, রিনি কখনো আপত্তি করেনি।

একবার ফোনে কথা বলার সময় বলেছিলো, তোমার সঙ্গে আমার জীবনযাপন অসম্ভব হয়েছিলো তা তুমি আমি দু'জনেই স্বীকার করবো। কিন্তু ছেলেটা যে তোমারও তা-ও মানতে হবে। তুমি সাজিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, আমি আপত্তি করবো কেন? একটাই ছোটো অনুরোধ, আমার কোনো অশান্তির কারণ যেন না ঘটে।

বিয়ের আগে রিনির সঙ্গে আমার তিন বছরের সম্পর্ক। বিয়ে করতে হয়েছিলো লুকিয়ে কোর্টে গিয়ে, তাদের বাসার কারো মত ছিলো না। দেড় বছরের মাথায় সাজিদ জন্মালে নাতির মুখ দেখে রিনির বাবা-মা বিয়েটা মেনে নিয়েছিলেন। আমাদের সংসার টেকেনি, তার দায় আমার একার। বিয়ে জিনিসটা যে দুই নারী-পুরুষের মধ্যে এক ধরনের দায়বদ্ধতা এবং চাইলেই তা ভাঙা যায় না, ভাঙতে নেই, এই বোধ আমার খুব গাঢ় ছিলো না। হয়তো আমার পারিবারিক ইতিহাস এর পেছনে কাজ করে থাকবে। আমি বিশ্বস্ত থাকতে পারিনি। এই জিনিস আমার মধ্যে কোথা থেকে এলো জানি না।

বুঝেছি দেরিতে, আগে জানলে হয়তো রিনিকে আমার জীবনের অভ্যন্তরে টেনে আনতাম না। ওর জন্যে আমার ভালোবাসা ছিলো খাদহীন। প্রকাশ্যে স্বীকার করা চলে না, কিন্তু হয়তো আজও সেই ভালোবাসার কিছু অবশিষ্ট আছে আমার ভেতরে। আমার জীবনের অংশ সে আর নয়, কিন্তু সাজিদের মা হিসেবে একটা অংশীদারিত্ব জীবনভর থেকে যাবে, কোনোকিছুতেই তা পাল্টাবে না।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা আসে। এতো বছর দূরে থাকা সাজিদকে কি আমি নিশি-ঋষির চেয়ে কম ভালোবাসি? নাকি সমান সমান? প্রথম সন্তানের জন্যে কিছু আলাদা দুর্বলতা সব বাবা-মায়েরই থাকে। তাহলে সাজিদের জন্যে আমার আলাদা টান থাকলে রিনিরও তাই। আমাদের জীবন আলাদা হয়ে গেলেও এখানে তাহলে আমরা এখনো যুক্ত আছি। নীলার বেলায় সে দুর্বলতা নিশির জন্যে। কে জানে এসব কি দিয়ে ওজন করা যায়, মাপা যায়।

সাজিদের কথা শুনে একটু উদ্বেগ হয়, তা অস্বীকার করতে পারি না। ওর বয়সী ছেলেমেয়েরা এখন বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে পারলে আর কিছু চায় না। অথচ সে আমেরিকায় এতো বছর বাস করার পর বাংলাদেশে ফিরতে চায়, তা খুব স্বাভাবিক লাগে না।

জিজ্ঞেস করি, কেন, মায়ের সঙ্গে কিছু হয়নি তো?

না বাবা, না। মা-র সঙ্গে কথা বলেই তোমাকে জানাচ্ছি।

সংশয় তবু যায় না। মনে হয়, সালাম সাহেবের সঙ্গে কোনো ঝামেলা হলো কি না। ভদ্রলোক খুবই ভালো শুনেছি, সাজিদকে নিজের ছেলের মতোই দেখেন। তবু যুবক বয়সী সৎপুত্রের সঙ্গে খটোমটো লাগতে কতোক্ষণ? ছেলে আমার সঙ্গে থাকলেও তা হতে পারতো।

সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না। পরের প্রশ্নটা এমনভাবে করি যা দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো সম্ভাবনাকে বেড় দিয়ে ধরা যায়। বলি, অন্য কোনো ঝামেলা বাধিয়ে বসিসনি তো?

একদম না। আমি ভালো ছেলে, বাবা। ইংরেজির আই অক্ষরের মতো সোজা।

আমাদের বসতি পৃথিবীর দুই প্রান্তে হলেও সম্পর্ক সহজ রাখা গেছে। ছোটোখাটো রসিকতা চলে। তার কথায় পাল্টা জিজ্ঞেস করি, বড়ো হাতের আই তো? ছোটো হাতেরটা কিন্তু খুব সোজা লাগে না।

বাপ-ব্যাটা মিলে হাসি হয়। আমার কিছু নিশ্চিন্ত লাগে। জিজ্ঞেস করি, তা বাপ তুই উল্টোদিকে হাঁটা দিলি কেন, বল তো?

কী রকম?

এই দেশের অর্ধেক মানুষ আমেরিকা যেতে চায়, আর তুই আসছিস বাংলাদেশে।

বাবা, যে কোনো সময় এখানে ফিরে আসার পথ আমার খোলা থাকছে। আমি আসলে তোমার সঙ্গে অন্তত কিছু সময় থাকতে চাই। তোমাকে আরেকটু বুঝতে চাই। ছোটোবেলার কথা কিছু মনে আছে, দূর থেকে যতোটা বুঝি সেই বোঝাটাও যাচাই করা দরকার।

খুব ভালো কথা। কিন্তু এখানে এসে কি টিকতে পারবি?

বাংলাদেশ তো আমার অচেনা জায়গা নয়, বাবা। দেখি সেখানে নিজে কিছু করতে পারি কি না। এখন তুমি আমাকে খোলাখুলি বলো, তোমার আপত্তি নেই তো?

কী আশ্চর্য, আমার ছেলে এতোদিন পর আসছে, আমার আপত্তি হবে কেন? পাগল নাকি?

সাজিদের হাসির শব্দ শোনা যায়। বলে, ছোটোবেলায় তুমি আমাকে পাগলা বলতে মনে আছে?

থাকবে না কেন? তোর মনে আছে দেখে অবাক হচ্ছি।

বাবা, আরেকটা কথা।

বল।

আমি কিন্তু এসে তোমার বাসায় উঠবো। তোমার অসুবিধা হবে না তো?

মায়ের সঙ্গে সাজিদ বেশ কয়েকবার এসেছে ঢাকায়। তখন থেকেছে রিনির সঙ্গেই। এই প্রথম সে একা আসছে। আমার অসুবিধা বলে সে কী জানতে চায়, বুঝতে পারি। নীলার সঙ্গে তার দেখা হলেও তেমন জানাশোনা তো হয়নি। নিশি-ঋষির সঙ্গেও খুব অল্প দেখা হয়েছে। নীলা কীভাবে নেবে, হয়তো তাই সাজিদ জানতে চায়। কী বলবো? সে বিষয়ে আমি নিজেও খুব নিশ্চিত হতে পারি না। সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলি, সেসব তোর ভাবার বিষয় না, আমি দেখবো। শুধু জানিয়ে দিস কবে তোকে আনতে এয়ারপোর্টে যেতে হবে।

কথা শেষ করে ভাবি, সাজিদ এলে তাকে থাকতে দেওয়া হবে কোথায়? দুটি ঘরে কোনোমতে থাকা আমাদের, তার কোথায় জায়গা হবে, কী করে? তার আসতে আরো মাসখানেক দেরি, সেসব পরে ভাবা যাবে। আপাতত কাজে মন দিই। চাকরিটা তো সবার আগে রাখতে হবে, তারপর অন্য কথা।

ঘড়িতে দেখি সাড়ে দশটা। ব্যাংক থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। এদিকে লাঞ্চের আয়োজন শেষ করে রেস্টুরেন্টের দরজা খুলে দিতে হবে এগারোটায়। দেরি হয়ে যাচ্ছে, আজ আর টাকা গোনার সময় নেই। ব্যাংকে তো গুনবেই, তখন দেখা যাবে। টাকা ব্যাগে ভরে কিচেনের কাজকর্ম এক নজর দেখে নিই। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বসে আছে। ঢাকা শহরে টাকাপয়সা নিয়ে চলাফেরা নিরাপদ নয়, কোনোকালে যে ছিলো তা-ও আজকাল আর মনে পড়ে না। রোজ সকালে এইরকম সময়ে মালিকের বা তার ছেলের গাড়ি আসে, ব্যাংকের কাজ শেষ হলে আমাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যায়।

কাচের দরজা দিয়ে বাইরে দেখে নিই, যতোদূর চোখ চলে। কাছাকাছি অচেনা লোকজন ঘোরাফেরা করছে দেখলে অপেক্ষা করার নিয়ম, যতোক্ষণ না নিরাপদ লাগে। আশেপাশে কাউকে না দেখে কালো পলিথিনে মোড়া টাকার ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে উঠে বসি। আকাশে মেঘ করে আসছে। বৃষ্টি হবে নাকি?

নীলা

ফোন বাজছে। একটু আগে নিশি-ঋষির ঘর গোছাতে গিয়েছিলাম, তখন হাতে ছিলো। সেখানে ভুলে রেখে এসেছি। দুই ছেলেমেয়ের কেউ বিছানা গোছাতে শিখলো না। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া সেরে বেরিয়ে যায়। বিছানার চাদর বালিশ এমন দোমড়ানো মোচড়ানো যে বিছানা দুটোকে ঘূর্ণিঝড়-উপদ্রুত এলাকা বলে মনে হয়। তবু দয়া করে যে সেগুলো মেঝেতে ফেলে যায় না, এই বেশি।

ছেলেমেয়েরা, তাদের বাবা বেরিয়ে গেলে দ্বিতীয় কাপ চা বানাই। একা একা বসে খাই। সকালের চা খাওয়া হয় কোনোমতে, দশটা কাজ করতে করতে। কোনো কোনোদিন ভুলে যাই, অর্ধেক খাওয়া ঠাণ্ডা চা পরে ফেলে দিতে হয়। দ্বিতীয় কাপটা খাওয়া হয় নিজের মতো করে। চা শেষ না হওয়া পর্যন্ত টিভির সামনে থাকি। নির্দিষ্ট কোনোকিছু দেখা নয়, রিমোট টিপে শুধু এ-চ্যানেল ও-চ্যানেল ঘোরাফেরা। দেশী-বিদেশী কতো চ্যানেল আসে এখন, চাইলে দিনভর রাতভর দেখা যায়।

বেশিক্ষণ টিভি দেখতে আমার ভালো লাগে না, কেমন যেন একটু মন খারাপ হয়। এই তো কয়েক বছর আগেও টিভি বলতে ছিলো এক বিটিভি, সন্ধ্যায় কয়েক ঘণ্টা চালু থাকতো। আমাদের সময়ে এতোগুলো চ্যানেল থাকলে আমার জীবন কেমন হতো, কে জানে! হয়তো অন্যরকম কিছু হতো না। টিভি চ্যানেলের সংখ্যা তো সমস্যা ছিলো না, ছিলো অন্যকিছু। টিভি দেখতে গেলে পুরনো কথা মনে পড়ে, পরিচিতদের কাউকে পর্দায় দেখলেও। দূরে থাকা, ভুলে থাকা ভালো।

চা শেষ করে রান্নাঘরে কিছু ধোয়া-মোছার কাজ সারতে হচ্ছিলো, এই সময় মোবাইল বাজলো। আজকাল বাসায় কাজের লোক পাওয়া আর দূর আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া একই রকম অসম্ভব হয়ে গেছে। সব নিজেকে করতে হয়। উঠে নিশি-ঋষির ঘরের দরজায় পৌঁছাতেই ফোন থেমে গেছে। কে হতে পারে? তুলে দেখি, নম্বর অচেনা। ইচ্ছে করলে কল ব্যাক করা যায়, করি না। যে-ই হোক, দরকার হলে আবার করবে।

আমাদের বাসায় ল্যান্ডলাইন ফোন নেই। আজকাল মোবাইল শস্তা হওয়াতে ল্যান্ডফোন না হলেও চলে। তিন মোবাইলের দুটো জামাল আর নিশির কাছে, আরেকটা আমার কাছে। ঋষির বায়না, তাকেও একটা দিতে হবে। স্কুলে তার অনেক বন্ধুর মোবাইল আছে। তাকে আরো বছর দুয়েক অপেক্ষা করতে হবে বলা হয়েছে।

চাই তো অনেককিছু। সবারই। আসবে কোত্থেকে? ছেলেমেয়ে বড়ো হয়েছে, তাদের আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা দরকার। ঘর ও পড়ার টেবিলের মতো একটামাত্র কমপিউটার তারা ভাগাভাগি করে। তা-ও নাকি পুরনো হয়ে গেছে, বদলাতে হবে। সামনে শীত, ঋষির শীতের জামাকাপড় দরকার, আগেরগুলো ছোটো হয়ে গেছে। কোথা থেকে কীভাবে ব্যবস্থা হবে জানি না। জামালের একার উপার্জনে আর চলছে না, মাসের শেষে যা ঘরে আনে তাতে কায়ক্লেশে চলে। বাসাভাড়া, গ্যাস-ইলেকট্রিক-বাজার খরচ, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা এইসবের বাইরে সবকিছুই বাড়তি কয়েক বছর ধরে। আরো কতোদিন এইভাবে চলবে, চালানা যাবে কে জানে!

ছেলেমেয়ে দুটোর মুখের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। এইরকম দিন এনে দিন খাওয়ার অবস্থা আমাদের সবসময় ছিলো না। ঋষি তখনো ছোটো, মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু নিশি এই বদলটা নিজের চোখে দেখেছে, কোথা থেকে কোথায় নামতে হলো আমাদের। প্রথম প্রথম কী মনমরা হয়ে থাকতো। বড়ো আদরে বড়ো হয়ে উঠছিলো সে। মুখ ফুটে বলামাত্র তার বাবা জিনিসটা এনে হাজির করে দিতো। সেই মেয়ে ক্রমে একেবারে কিচ্ছু না চাইতেও শিখে গেলো।

এইসব ভাবলে নিজেকে শান্ত রাখা কঠিন হয়ে যায়। তাই মনে করতে চাই না। অথচ উপায় কী? মনে পড়ার কতো অজুহাত কীভাবে যেন তৈরি হয়ে যায়।

এইচএসসি দিয়ে আমি বিএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম। জামালের সঙ্গে বিয়ে হলে লেখাপড়া আর করা হয়নি। বিদ্যার জোর থাকলে বা তেমন কোনো কাজ জানলে আমি কিছু আয়-উপার্জনের চেষ্টা করতে পারতাম। সে উপায় নেই। জানার মধ্যে জানি এক গান, তা-ও আর আমার গাওয়া হবে না। বিশুদ্ধ গৃহবধূ হতে আমি চাইনি, হওয়ার কথা ছিলো না, অথচ তাই হয়ে বসে আছি।

আজকের যে জামাল, তাকে আমি বিয়ে করিনি। এখনকার এই জামালকে চিনি না, চিনতে কষ্ট হয়। সে নিজেও কি নিজেকে আর চিনতে পারে? ঊনিশ বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়, তখন সে অন্য মানুষ ছিলো। হয়তো অন্য কেউ। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ সুখী চেহারার জামাল এখন পুরনো কাঠামোর ওপরে অন্য কেউ। হাসিখুশি মুখচোখ চোয়াড়ে কর্কশ হয়ে গেছে, ফরসা মুখে পোড়া তামাটে রঙের পরত, শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙেচুরে পড়ার দশা। সহজ আরামপ্রিয় জীবনে অভ্যস্ত মানুষটার চেহারায় খেটে খাওয়া মানুষের রুক্ষতা এখন। শুধু বয়সের কারণে যে সবটা নয়, তা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে? ওর বন্ধুদের কারো মুখে ওরকম ধস দেখি না।

রান্নাঘরের ধোয়ামোছা শেষ করে বসার ঘরে ফ্যান চালিয়ে বসেছি। ভ্যাপসা গরম পড়েছে আজ। আবার মোবাইল বাজে। এবার ফোন হাতের কাছেই আছে। তুলে হ্যালো বলি।

ওপারে অচেনা পুরুষের গলা। ভদ্রোচিত বিনয়ে জিজ্ঞেস করে, আমি কি নীলাঞ্জনা সুলতানার সঙ্গে কথা বলছি?

হ্যাঁ, আমি নীলাঞ্জনা।

আমি সৈকত আহমেদ কথা বলছি সাপ্তাহিক অষ্টপ্রহর পত্রিকা থেকে। আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই আমাদের কাগজের জন্যে।

অষ্টপ্রহর পত্রিকার নাম শুনেছি বলে মনে করতে পারি না। কতো রকমের কাগজ যে হয়েছে এখন! সে কথা মুখের ওপর বলা যায় না। বলি, আমি তো ভাই গান-বাজনা ছেড়ে দিয়েছি নয়-দশ বছর হয়ে গেলো। আর গাইবোও না কোনোদিন।

আমরা সেরকম বিষয় নিয়েই একটা বিশেষ ফিচার চালু করেছি আমাদের পত্রিকায়। এই বিভাগে শুধু তাঁদের কথা থাকবে যাঁরা একসময় গানে বা অভিনয়ে নাম করেছিলেন, কিন্তু এখন হারিয়ে গেছেন।

ভাবি, হারিয়ে গেছি? কোথায়? কীভাবে? আশ্চর্য তো, আমি জানলামই না?

বিনীতভাবে বলি, আমি অপারগ। আমাকে ছেড়ে দিন।

সৈকত আহমেদ নাছোড়বান্দার মতো বলে, বেশি সময় নেবো না। আপনার সুবিধামতো আধ ঘণ্টা সময় দিন। আমি এই কাগজের সম্পাদক, আমি নিজে আসবো একজন ফোটোগ্রাফার নিয়ে, সে আপনার কয়েকটা ছবি তুলবে।

জিজ্ঞাসা করি, আমার ফোন নম্বর পেলেন কোথায়?

জামাল ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি।

ও, আচ্ছা। কিন্তু ভাই, আমাকে মাফ করতে হবে। আমি পারবো না।

আরো কিছুক্ষণ ঝুলোঝুলির পর অষ্টপ্রহর সম্পাদকের হাত থেকে নিস্তার পাই। শেষের দিকে একটু রূঢ় হয়েছিলাম। কিছু করার নেই, এরা এক কথা একবার বললে বোঝে না। বুঝলেও কানে তোলে না। পত্রিকার পাতা ভরানোর জন্যে কতো যে ফন্দি বের করে! যারা আর গান করে না, অভিনয় থেকে দূরে সরে গেছে তাদের সাক্ষাৎকার। মানুষের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। এরা হয়তো ভাবে, সাক্ষাৎকারের কথা বললে সবাই হামলে পড়বে। তাদের দোষ দিয়ে কী হবে। তারা এইরকমই দেখে অভ্যস্ত। কেউ কেউ যে প্রচারের আলো থেকে পালাতে চায়, তারা হয়তো তা জানেও না।

মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে বসে থাকি। আজ বাজার করতে হবে না, রান্নাবান্নার কাজও বেশি নেই। কালকের রান্না করা মাংস ফ্রিজে তোলা আছে, জামালের জন্যে ছোটো মাছের তরকারিও। মেয়ে ডাল ছাড়া ভাত খেতে চায় না, শুধু ডালটা করবো, আর ভাত। ইচ্ছে হলে একটা সবজি করা যায়। ঘণ্টা দুয়েক পরে শুরু করলেই চলবে। সোফায় আধশোয়া হয়ে আনমনা লাগে। জামাল ফোন নম্বর দিলো কেন পত্রিকার লোককে? আরো কাউকে দিয়েছে নাকি কে জানে! সে কি চায় আমি গান করি আবার?

না জামাল, আমি আর ফিরবো না। যা বিসর্জন দিয়েছি, তাকে আর তুলে আনার দরকার নেই। কী হবে আর! বাংলা গানের পৃথিবী নীলাঞ্জনা সুলতানা বিহনে ওলট-পালট হয়ে যায়নি। আমি অসাধারণ কেউ ছিলাম না, গাইতে ভালো লাগতো। কারো ভালো লাগে জানলে অন্য এক ধরনের পরিতৃপ্তি বোধ করতাম। এই তো! আমার সেখানে না হয় কিছু ঘাটতি পড়বে, তাতে কী এসে গেলো!

হঠাৎ মুসার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। এই মাতাল ইচ্ছেটা মাঝে মাঝে হয়। কিন্তু আমি জানি, নম্বর জানা থাকলেও তাকে আমি ফোন করবো না। সে যাতে আমার সন্ধান না পায় তার জন্যে আমার মোবাইল নম্বর বদলে নিয়েছি। এই ঢাকা শহরে চাইলে সে আমাকে ঠিকই খুঁজে পাবে, তাতে সন্দেহ নেই। আজকাল তার হাতে সময় বেশি থাকার কথা নয়, রেডিও-টিভি আর সিনেমার গান, সিডি-ক্যাসেট এইসব নিয়ে সে আজকাল ভালোই ব্যস্ত থাকে জানি। আমার গান ছেড়ে দেওয়ার পেছনে মুসার প্রত্যক্ষ

ভূমিকা ছিলো না, অজান্তে শুধু উপলক্ষ হয়ে উঠেছিলো। সে আজও জানে না, হয়তো অনুমানে কিছু বুঝেছিলো। ঠিক জানা নেই। আমি নিজে কোনোদিন বলিনি, দরকার মনে হয়নি।

নিশি তখন চার বছরের, আমাদের বেশ ফুরফুরে একটা জীবন কাটছে। জামাল তার ব্যবসাপত্র নিয়ে আছে, আমার আছে গান আর নিশি নামের একটা জ্যান্ত খেলনা। জামাল ঘরে থাকলে ভাগ বসায়, মেয়ে তখন দু'জনের খেলনা। জামাল আগে একবার বিয়ে করেছিলো, একটা ছেলেও আছে – এইসব নতুন কোনো কথা নয়, জেনেশুনেই তার বউ হয়েছিলাম। ছোটোখাটো কিছু অশান্তি ও না বোঝাবুঝির চোরকাঁটা, তা কোন সংসারে না থাকে! তারপরেও বেশ দিন ছিলো তখন।

মফস্বল শহর থেকে সদ্য-আসা ছেলে মুসা হারুন। নজরুল জন্মজয়ন্তীতে টিভির এক অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে আমাকে ডুয়েট গাইতে বলা হয়। তার গান শুধু নয়, নামও আগে কখনো শুনেছি বলে মনে করতে পারি না। রিহার্সালের সময় পরিচয়। লাজুক মুখচোরা ধরনের সরল-সোজা ছেলে, ঢাকা এসেছে অল্প কিছুদিন হয়। কথায় যশোর অঞ্চলের স্পষ্ট টান অটুট। গলা ভালো – সুরেলা, গভীর ও পুরুয়ালি। বয়সে আমার বছর দুই-তিনেকের ছোটোই হবে অনুমান হয়।

প্রথম রিহার্সালের দিন এক ফাঁকে মুসা বলে, আপা আপনার গান আমার খুব ভালো লাগে।

প্রশংসাটা সত্যি হতে পারে, মিথ্যা হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু সত্যি বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। স্তুতি কার না ভালো লাগে!

রিহার্সালের সময় জানা যায়, আমাদের গানটি আউটডোরে শুটিং করা হবে। গান আগে রেকর্ড করা হবে, বাইরের দৃশ্যায়নের সময় আমরা শুধু ঠোঁট মেলাবো। মিউজিক ভিডিওর ধারণা তখন মাত্র প্রচলন হচ্ছে। 'মোরা আর জনমে হংসমিথুন ছিলেম' গানটির জন্যে উপযুক্ত জায়গা খুঁজে রাখা হয়েছিলো, শেষ বৈশাখের তীব্র গরমে সারাদিন ধরে শুটিং হলো বলধা গার্ডেন ও রমনা পার্কে। দৃশ্যায়ন হোক বা গায়কী হোক অথবা দুইয়ে মিলেই হোক, গানটা বেশ জনপ্রিয়তা পায়। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমনকি ফিলার হিসেবেও ঘন ঘন প্রচার করা হতে থাকে।

গানটি মুসা এবং আমাকে এক ধরনের পরিচিতি দেয়। এখানে-ওখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাদের জুড়ি বেঁধে আমন্ত্রণ আসতে থাকে, যদিও ছোটো নিশিকে রেখে ঢাকার বাইরে যাওয়া হয়নি। যাবো, কখনো ভাবিওনি। ঢাকার বাইরের আমন্ত্রণগুলো এক কথায় নাকচ হয়ে যেতো। মঞ্চে উঠলে হংসমিথুন গাওয়ার দাবি, মুসার সঙ্গে। দাবি পূরণে প্রচুর করতালি, তারও মাদকতা আছে।

তবে সত্যি আমার মাথা ঘুরে যায়নি। গিয়েছিলো জামালের। কে কী বোঝালো নাকি নিজেই বুঝলো জানি না, মুসার সঙ্গে আমার গোপন সম্পর্ক আবিষ্কার করে বসলো সে। আমাকে জিজ্ঞেস করা নয়, ব্যাখ্যা চাওয়া নয়। একদিন সরাসরি সিদ্ধান্ত জানায় সে, ওই ছেলের সঙ্গে তোমার এতো মাখামাখি কীসের? ওর সঙ্গে তোমাকে যেন আর গাইতে না দেখি।

মাখামাখি কোথায় কীভাবে দেখেছে সে, বোঝা গেলো না। দু'চারদিন মুসা আমদের বাসায় এসেছে, একসঙ্গে বসে নতুন গান তুলেছি। সবই জামালের উপস্থিতিতে। তার সঙ্গে সে শালা-দুলাভাই সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছিলো, দু'জনের হাসিঠাট্টাও কম হতো না। মুসা মামা এলে নিশি তৎক্ষণাৎ তার কোলে। আমরা হারমোনিয়াম নিয়ে বসলে সে-ও বসে যেতো গলা মেলাতে। তবু বিনা মেঘেও কখনো কখনো বাজ পড়ে, জানা হলো। বজ্রপাত সচরাচর মাথার ওপরে হয় এবং তা পোড়ানোর ক্ষমতাও ধরে।

দিনের পর দিন জামালের কাছে একই অভিযোগ শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে যাই। ভালো লাগে না, সরল-সোজা জীবন হঠাৎই খুব জটিল লাগতে থাকে। জামালের জন্যে ভালোবাসা তখন কতোটুকু অবশিষ্ট ছিলো আমার, বলা শক্ত। সন্দেহ-বাতিক যে মানুষকে কতো উন্মত্ত করতে পারে, কোনোদিন জানতামই না। কথা কাটাকাটির সময় একদিন জামালের হাত উঠলো আমার গায়ে। ফুলে ওঠা বাঁ চোখের ওপরে কালসিটে দাগ দেখে বুঝে যাই, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসে গেছে।

জামাল আমাকে গাইতে নিষেধ করেনি, শুধুমাত্র মুসার সঙ্গে গাওয়া চলবে না বলছে। কিন্তু টের পাই, আজ কথা উঠেছে, কাল আর কাউকে নিয়ে হবে। আমাকে গান ছাড়তে হবে, না হয় এই সংসার। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবি, না-ই হলো আমার গান গাওয়ার সাধ পূরণ। সবার সব ইচ্ছে পূর্ণ হবে, তার কোনো মানে নেই। আমারও হবে না। কী এসে যাবে তাতে? পৃথিবীর কারো কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু পাঁচ বছরের নিশির জীবনে বাবা-মা দু'জনকেই দরকার, একজনকেও বাদ দেওয়া চলে না। তখন আমার শরীরের ভেতরে ঋষিও উঁকি দিচ্ছে।

মনস্থির করা সহজ হয়ে যায়। রেডিও-টিভির অনুষ্ঠান ফিরিয়ে দিই, মঞ্চের অনুষ্ঠানও। উৎকণ্ঠা নিয়ে মুসা আসে। জিজ্ঞেস করে, কী হলো তোর, নীলা আপা?

অনেক আগেই ওর সঙ্গে সম্পর্ক তুই-তোকারিতে এসে গিয়েছিলো। বললাম, ভালো লাগে না রে।

বাজে কথা বলছিস তুই।

বাজে হলে বাজে, এসব নিয়ে আমাকে আর বিরক্ত করতে আসিস না।

স্তম্ভিত মুখে মুসা আমার দিকে তাকায়। কী বোঝে কে জানে, অর্ধেক খাওয়া চা রেখে সে উঠে চলে যায়। আর সে কখনো আসেনি, আমিও আসতে বলিনি। ঋষি হওয়ার বছর দুয়েক পরে নিজেই একদিন ফোন করি। বাসায় একা থাকলে মাঝেমধ্যে ফোনে কথা বলতাম। ওই পর্যন্তই। তা-ও একসময় বন্ধ করে দিই, কিছু না জানিয়ে মোবাইল নম্বর পাল্টে ফেলি।

গানের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক আমার আর নেই। শোনাও ছেড়েছি। অন্য কেউ শুনছে, তখন কানে এলে কিছু করার নেই। নিজের আগ্রহে শুনি না। গাওয়ার প্রশ্ন নেই, একটু গুনগুন করা, তা-ও করি না। একা বাসায় থাকলে কখনো একেবারে ভেতর থেকে কোনো কোনো সুর লতিয়ে ওঠে, গলায় উঠে আসতে চায়। তখন অন্য কিছুতে মন দিই। নিজের কাছে পালিয়ে থাকা। খাটের নিচে রাখা হারমোনিয়াম আমার পুরনো পরিচয়ের স্মারক হয়ে আছে। আজকাল আর তাকিয়েও দেখি না। শুধু জানি, জিনিসটা ওখানেই আছে। থাক। দীর্ঘশ্বাস প্রকাশ্য করতে নেই।

জামালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন এক ছাদের নিচে বাস করার চেয়ে বেশি কিছু নয়। দরকারি কথা ছাড়া এখন কথাও তেমন হয় না, তাতে ছেলেমেয়েদের সামনে কথা কাটাকাটির সম্ভাবনা কমে। ব্যবস্থাটা দু'জনেই মেনে নিয়েছি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের না-বলা চুক্তি।

বিকেলের দিকে নিশি-ঋষি না ফেরা পর্যন্ত সময়টা বেশিরভাগ সময়ই খুব ভারী ঠেকে। নিজেকে একা আর পরিত্যক্ত লাগে। বিয়ের সময় থেকে বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়েছে। হিন্দু সাহা পরিবারের মেয়ে মুসলমানকে বিয়ে করবে, তা মানতে তারা অসম্মত। জামালের আগে একবার বিয়ে হয়েছিলো, তা-ও এক অপরাধ। নীলাঞ্জনা সাহা থেকে নীলাঞ্জনা সুলতানা। বাবা-মাকে ছাড়তে হলো। অথবা তারাই আমাকে ছেড়েছে। এক ছোটো বোন কিছুটা লুকিয়ে যোগাযোগ রাখতো, সে-ও

বিয়ে করে পরদেশী হয়েছে অনেক বছর হয়ে গেলো। কালেভদ্রে ফোন আসে তার। সবকিছু আমার ঠিকঠাক চলছে, এরকম ধারণাই তাকে দিতে হয়। আর কী বলা যায়?

ছেলেমেয়েরা আমার বাবা-মাকে চিনলো না, আমার দিকের আর কোনো আত্মীয়-স্বজনকেও নয়। জামালের বাবা-মাকে তারা কিছু পেয়েছে, তা-ও নামমাত্র বলা যায়। বলতে গেলে আত্মীয়-পরিজন বিহনেই তারা বড়ো হয়ে উঠলো। নিশি তবু তার বাবার বন্ধুবান্ধবদের আঙ্কল হিসেবে পেয়েছিলো। ঋষি বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে তারাও কোথায় নেই হয়ে গেলো। এখন কেউ তেমন যোগাযোগ রাখে না।

বন্ধুদের সঙ্গে জামাল ব্যবসা করছিলো তার প্রথম বিয়ের পর থেকেই। কী নিয়ে কী হলো, ভালো করে জানি না, ব্যবসা থেকে বেরিয়ে এলো সে। সেই ব্যবসা এখনো আছে, আর সবাই আছে, জামাল শুধু নেই। তারা এখন তার বন্ধুও নয়। জামাল তার টাকাপয়সাগুলো একত্রে ফিরিয়ে আনতে পারলো না, পারলে নিজে নতুন কিছু একটা করার চেষ্টা করতে পারতো। দফায় দফায় অল্প অল্প করে পেয়ে সেই টাকায় কয়েক বছর ধরে সংসার চালাতে হলো। তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া বাড়িটাও বিক্রি করে ভাড়া বাসায় উঠতে হলো। নিরুপায় হয়ে এই বয়সে তাকে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে। ভাবি, নামতে নামতে কোথায় কোথায় চলে এলাম। আজকাল কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লজ্জা করে। দুঃস্থ দীন-হীন এই জীবনের কথা লুকিয়ে রাখতে হয়।

আমার নিজের পুরনো বন্ধুবান্ধব যারা ছিলো, তারাও কে কোথায় খবর রাখি না। ইচ্ছে করে না। এক নাজনীনই অনেকটা জোর করে নিজে থেকে যোগাযোগ রাখে। একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে সেক্রেটারির কাজ করে সে। মাঝেমধ্যে হঠাৎ হঠাৎ তার ফোন আসে। আমার সব কথা শুধু তার কাছ থেকেই লুকানো যায়নি। তবু নিয়মিত যোগাযোগ হয়ে ওঠে না, চাইলেও হয়তো পেরে ওঠে না। সংসারে স্বামী-পুত্র তো আছেই, আর অফিসে আছে তার বস। বসের সঙ্গে একটা প্রণয় ও প্রশ্রয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তার, ব্যস্ততা কি কম! ফুলটাইম চাকরি, সংসার এবং একই সঙ্গে দু'জন পুরুষকে তুষ্ট রেখে সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া। পারেও সে। সবকিছু মিলিয়ে তবু খুব সুখীই লাগে তাকে, কোনো অপরাধবোধ নেই।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন তোর বর? ছেলে?

তার কথা পরিষ্কার। বলে, কাউকে তো ঠকাচ্ছি না। বাইরের যে আমি, তাকে বাসার দরজার বাইরে রেখে আসি, ভেতরে কখনো নিই না। ঘরে সবার জন্যে আমার যা করণীয়, সব করছি। উৎসাহ নিয়ে ভালোবেসেই করছি, কোনো ফাঁকি নেই। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে রান্না করি, সবাইকে খাওয়াই। ছেলেকে সময় দিই, তখন আমি শুধু তার মা। তারপর বরের পাশে বসে তার কাঁধে মাথা এলিয়ে বসে টিভি দেখি, আদুরে বেড়ালের মতো আদর খাই। রাতে বিছানায় তার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিই। সে খুশি, আমিও। খুব আনন্দে আছি।

অফিসে বদনাম হয় না?

কেউ জানলে তো!

কী রকম?

তুই কি ভাবিস আমরা অফিসে বসে সারাক্ষণ প্রেম করি? অফিসে সে বস, আমি অধস্তন কর্মচারী। দরকার হলে আর সবার মতো ধমক বকা-ঝকা খাই মুখ নিচু করে। সেসব আবার সে পুষিয়ে দেয় অফিসের বাইরে। বউকে না জানিয়ে ধানমণ্ডিতে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে, সময়

ঠিক করে নিয়ে দু'জনে আলাদা সেখানে যাই। কিছু সময় পরে নীরিহ মুখ করে বেরিয়ে আসি। সাবধানে থাকি খুব। ধরা পড়তে পারি, কিন্তু পড়ছি না, এরও একটা আলাদা মজা আছে। থ্রিলিং।

বসের বউয়ের জন্যে তোর খারাপ লাগে না? আরেকজনের পুরুষের ওপর ভাগ বসাচ্ছিস।

তার বউয়ের সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক? তাকে নিয়ে ভাবতে যাবো কেন? খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে সে-ও বরকে লুকিয়ে কোথাও প্রেম করে বেড়াচ্ছে।

নাজনীনের কাছে শোনা, ঢাকা শহরে আজকাল স্বামী-সংসার রেখে পাশাপাশি একটু খুচরো প্রেম করা নাকি ঘরের বউদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। ফ্যাশনেবলও বটে। আমাকে বলে, তুইও একটা প্রেম-ট্রেম করে দেখ না। তোর মন খারাপ আর লাগবে না দেখবি। তখন মনে হবে কারো কাছে তোরও কিছু দাম আছে, তুই ফ্যালনা কিছু না। অনেক ফুর্তিতে থাকবি।

শুনে আমি হাসি। চুপ করে থাকি। আমাকে দিয়ে হবে না, আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে!

মনে পড়ে, টিভির এক প্রযোজক আমার প্রেমে পড়েছিলো। অনেক অনেককাল আগে। অন্য কোনো জন্মের কথা বলে মনে হয়। জামালের সঙ্গে পরিচয়ের আগে। লোকটা তখনই তিন ছেলের বাবা, বড়ো ছেলে আমার মতোই কলেজে পড়ে। কাতর মুখে বলেছিলো, তুমি চাইলে সব ছেড়েছুড়ে তোমাকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চাই।

হাসি পাওয়া ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া তখন আমার হয়নি। হওয়ার কথা নয়। গানের গলা আমার ভালো, অনেকেই বলতো। আমি দেখতে খুব সুন্দর নই, গড়পড়তা। গায়ের রং ফর্সা হলে কী হতো বলা যায় না, এ দেশে সুন্দরীর প্রথম যোগ্যতা ফর্সা হওয়া। আমার রং কালোর ধারেকাছে, লোকে রেখেঢেকে শ্যামলা বলার ভদ্রতা দেখায়। বাবার বয়সী লোকটা আমার মধ্যে কী দেখেছিলো বুঝি না। জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কখনো কখনো মনে হয়, জানতে পারলে মন্দ হতো না।

তখন হ্যাঁ বললে কীররকম হতো আমার জীবন? এখনকার চেয়ে কতোটা আলাদা? জানার উপায় নেই, কখনো জানা হবে না। জিজ্ঞাসা করারও উপায় নেই আর, খবরের কাগজে সেদিন তার মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়েছে দেখলাম। মনে হলো, তাহলে এই পর্যন্তই তার আয়ু ছিলো। আমি তখন তার নতুন বউ হলে আজ আমি বিধবা হতাম। নাকি আমাকে বিয়ে করতে পারলে তার আয়ু বাড়তো? এইরকম উদ্ভট সব কথা মনে আসে।

এসব ভাবলে আমার চলে না। নিজেকে ব্যস্ত রাখার অজুহাতে রান্নাবান্না বা ঘরের আর সব কাজের বাইরে নতুন কিছু কাজ আবিষ্কার করি। পুরনো অ্যালবাম থেকে ছবিগুলো খুলে নতুন করে সাজাতে বসে যাই। সেগুলিও একেকটা দীর্ঘশ্বাসের ঝাঁপি। দরকার কিছু নেই, কী কাজে লাগবে তা-ও জানি না, তবু কখনো কখনো পুরনো শাড়ি-টাড়ি জোড়া দিয়ে কাঁথা সেলাই করি। কয়েকদিনেই ক্লান্তি লাগে। তখন তুলে রাখি, করার মতো নতুন কিছু একটা খুঁজি। এরকম খুঁজতে খুঁজতেই ধর্মকর্মের চেষ্টা করা। হিন্দু পরিবারে বড়ো হয়েছি, সুরা-কালাম শিখতে হলো। রোজা রাখতে কষ্ট হতো প্রথম প্রথম। শিখে নিয়েছি। নামাজ শিখেছি।

মনেপ্রাণে খুব ধার্মিক নই। এইসব আসলে এক ধরনের বর্ম, যা আমাকে অনেককিছু থেকে রক্ষা করে, আড়াল করে রাখে। বাইরে যাওয়া প্রায় হয়ই না, ইচ্ছে করে যাই না। গেলে মুখে পর্দা লাগাই। চেনা কাউকে দেখলে লুকিয়ে যেতে পারি। কেউ চট করে নীলাঞ্জনা সুলতানাকে চিনে না ফেলে।

আমার জীবন এখন এই সংসারটুকু নিয়ে। আমার একাগ্রতা ভঙ্গুর হয়, মন কিছুমাত্র বিচলিত বা বিক্ষিপ্ত হয়, এমন সবকিছু এড়িয়ে চলি। মনের শূন্যতা ঢাকি প্রাণপণে। মানুষের হৃদয় ভালোবাসার জন্যে কাঙাল চিরকাল। জামালের কাছে পাবো ভেবে আশাহত হয়েছি, অন্য কোথাও কারো কাছে তা পাওয়া হয়তো অসম্ভব নয়। নাজনীন না বললেও জানি। তবু প্রলোভনটা এড়াতে চাই। গান গাইতো যে নীলাঞ্জনা সুলতানা তাকে আমি আর চিনি না। অষ্টপ্রহরের সম্পাদক আমার জীবনে কেউ নয়। মুসাও না। হৃদয় বিচলিত হলে, প্রলুব্ধ হওয়ার উপক্রম হলে মনে মনে ক্রমাগত বলতে থাকি, নিশি-ঋষির মা আমি, আর কিছু নই, কেউ নই। হতেও চাই না।

জামাল আমার ছেলেমেয়েদের বাবা, কিন্তু আমার জীবনে সে এখন ঠিক কতোটুকু আছে আমি নিশ্চিত নই। এই পুরুষের জন্যে আমি কী না করেছি, কী না করতে পারতাম। বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন, চেনা সমাজ, এমনকী ধর্ম – সমস্ত ছাড়লাম একজন পুরুষের ভালোবাসার জন্যে। তার অতীত দেখতে যাইনি, জেনে উপেক্ষা করেছি। শুধু তার মনোযোগ ও ভালোবাসা ছিলো আমার চাওয়া। এখন আশা হয়তো আর নেই, তবু আশা ছাড়া হয় না। মানুষের জীবনে ওইটুকু ছাড়া আর কী অবশিষ্ট থাকে?

জামাল

আজ ছুটি নিয়েছি। পরশু সাজিদ তার আসার দিনতারিখ জানিয়েছে। আগেরবার ফোন করে তার আসার ইচ্ছে জানানোর পর কেন যেন খুব বিশ্বাস হয়নি। হতে পারে, বিশ্বাস করতে চাইনি। মনে মনে হয়তো চেয়েছিলাম, ঠিক এখনই সে না আসুক। তার জন্যে আমার টান-ভালোবাসা আছে, সব পিতার যেমন পুত্রের জন্যে থাকে। তবু ওর বোধবুদ্ধি হওয়ার বয়স থেকে তো তাকে আমার দেখা হয়নি, কাছাকাছি থাকার জন্যে সে বা আমি কতোটা তৈরি তা-ও ঠিক করে বলা যায় না। আর বাস্তব সমস্যা, এলে তাকে থাকতে দেবো কোথায়? ছেলে এসে আমার বাসায় উঠবে, তাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার জীবন খুব স্বাভাবিক জীবন নয়। বাসাও আমার একার কথায় চলে না। নীলাকে এখনো বলা হয়নি।

হাতে আর দিন দশেক সময়। এর মধ্যে নীলার সঙ্গে কথা বলা দরকার। তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, অনুমান করা খুব কঠিন নয়। বাসায় একজন বাড়তি মানুষের জায়গা করা দুষ্কর, তা-ও আবার সে যদি হয় তার অদেখা ভূতপূর্ব সতীনের ছেলে। মেয়ে বড়ো হচ্ছে, তাকে নিয়েও নীলার উদ্বেগের শেষ নেই। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা আমার হাতে নেই। কীভাবে বলা যাবে, তা এখনো জানি না।

সকালে নাশতার টেবিলে বসে ঘোষণা দিই, আজ আমার ছুটি।

নীলা চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে এক পলক তাকায়। যেন বলতে চায়, কেন, কী হলো? শরীর খারাপ নয় তো? কিছু বলে না, কেতলিতে পানি ভরছে, চা বসাবে। হয়তো প্রশ্নগুলো সে করতে চায়, হয়তো চায় না। কিন্তু আমার সেরকম ধারণা হয়।

তার হয়ে জিজ্ঞাসা করে নিশি। আশ্বস্ত করে বলি, না এমনিতেই। তুই বেরোবি কখন? আমি যাবো তোর সঙ্গে, ওদিকে আমার একটা কাজ আছে। তোর অসুবিধা নেই তো?

অসুবিধা হবে কেন? যাবো আর আধ ঘণ্টার মধ্যে।

আসলে আমার বাইরে কাজ কিছু নেই। যেতে যেতে সাজিদ-সংকট নিয়ে নিশির সঙ্গে পরামর্শ করা। আগেও বাপ-মেয়েতে এরকম শলা-পরামর্শ হয়েছে। এইসবে নিশির মাথা খুব পরিষ্কার। সহজ কোনো একটা উপায় হয়তো আমি ভাবিইনি, সে চট করে বাতলে দিতে পারে।

মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বার বার ঘড়ি দেখছিলো। বুঝলাম, তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। রিকশার বদলে সিএনজি নিই। মেয়েকে আমার সংকটের বিবরণ দিই। তাকে চিন্তিত লাগে। বলে, কতোদিনের জন্যে আসছে সাজিদ ভাইয়া?

ঠিক জানি না। বলছে তো অনেকদিন থাকবে। তেমন হলে থেকেও যেতে পারে।

নিশির মাথায় নতুন কিছু খেলে না। বলে, মা-র সঙ্গে কথা বলো। যা-ই করা হোক, তাকে ছাড়া তো হবে না।

তা আমার জানা। নিশিকে নামিয়ে দিয়ে শাহবাগ। কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি করে সিনোরিটায় চা নিয়ে বসি। কতোদিন পরে সিনোরিটায় আসা হলো। সন্ধ্যায় পুরনো দুয়েকজনকে হয়তো পাওয়া যায় এখনো। ঠিক জানি না। কারো সঙ্গেই আজকাল যোগাযোগ নেই।

চা শেষ হলে রাস্তায় নেমে হাঁটি। দিন দুয়েক আগেও বেশ ভ্যাপসা গরম গেছে, আজ একদম নেই। রোদ এখনো বেশি তেজি হয়ে ওঠেনি। হাঁটতে বেশ লাগছে। ডাক্তারের পরামর্শ, আর কিছু না হোক প্রতিদিন কিছু হাঁটাহাঁটি করা উচিত। সময় হয় কোথায়? আজ একটা সুযোগ হয়েছে, আবহাওয়াও অনুকুল, হেঁটে বাসায় যাওয়া যায়। বেশি দূরের পথ নয়, ভালো না লাগলে রিকশায় উঠে পড়া যাবে।

আচমকা মনে হয়, আচ্ছা রিনিকে ফোন করে কিছু একটা পরামর্শ চাওয়া যায়? তার বাপের বাড়িতে সাজিদের আপাতত ওঠার ব্যবস্থা করা গেলে কেমন হয়? একটু সময় পেলে একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবো। নাম্বার আছে, কিন্তু রিনিকে ফোন করা চলে না। সংকট আমার, তার নয়।

পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে আমাকে জীবনের প্রথম চাকরির বাজারে নিজেকে প্রার্থী হিসেবে নামিয়ে দিতে হয়েছিলো। বছর পাঁচেক হয়ে গেলো। কঠিন কাজ। জানা ছিলো, তবে কতোটা কঠিন সে ধারণা তখনো হয়নি। চাকরির বাজারে বয়সে আটকায়। জীবনের সবকিছুতেই বয়স একটা বড়ো ভূমিকা নিয়ে থাকে, তা টের পাই। কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না করেও নির্বিঘ্নে বলে দেওয়া যায়, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাগুলো আগের জায়গায় আর নেই, সরে সরে যাচ্ছে। যারা চাকরি দেওয়ার অধিকারী, তারা হয়তো তা আগেভাগেই জানে, তাই বয়স নিয়ে সতর্কতা।

চাকরি করার সিদ্ধান্ত সহজ হয়নি। খুব প্রাচুর্য না হলেও এক ধরনের সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য আমার জীবনে বরাবর ছিলো। কর্মজীবনে সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছিলো। সীমিত হলেও উচ্চতা আত্মবিশ্বাস দেয়। পতনের কথা কখনো ভাবা হয়নি। জীবন এইভাবেই চলবে ধরে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে থাকা। ধস নামতে শুরু করলে গড়িয়ে পড়তে পড়তেও মনে হয়েছিলো, একটা কিছু হাতের নাগালে নিশ্চয়ই এসে যাবে। তখন আবার উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হবে। হয়নি। নাগালে পাওয়া অবলম্বনগুলি আমার ভারের তুলনায় যথেষ্ট সমর্থ ছিলো না। গড়িয়ে নামতে নামতে কেটে যায় বছর দশেক।

একসময় বুঝি, যা খুঁজছি বা পাওয়া যাবে বলে আশা করছি তা আর আসবে না। দেরি হলে হয়েছে। মানুষের জীবনে উপযুক্তভাবে বাঁচার চেষ্টা ছাড়া তো আর বড়ো কোনো কাজ নেই। পঞ্চাশে পৌঁছে প্রথমবারের মতো মনে হলো, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

একটা বয়সের পরে সরকারি চাকরিতে আর ঢোকা যায় না। শুনে এসেছি বৃটিশদের সময় থেকেই সরকারের চাকরির খুব কদর, স্কুলে ভর্তি করার সময় ছেলেমেয়েদের বয়স এক-দুই বছর কমিয়ে লেখা হতো। বাপ-মায়ের আশা, পাশ-টাশ করার পর ছেলে চাকরি পাওয়ার জন্যে হাতে কিছু বেশি সময় পাবে। হোক না তা কয়েক মাস বা এক বছর। কম কীসে? বৃটিশরা গেছে সেই কবে, পাকিস্তান গেলো তা-ও অনেকদিন, নিয়ম পাল্টায়নি। কিছু জিনিস হয়তো কোনোকালে বদলায় না। আমার সার্টিফিকেটে যে জন্মতারিখ লেখা তার সঙ্গে আসল জন্মদিনের পার্থক্য কয়েক মাসের। সরকারি চাকরিতে ঢোকার বয়স আমার কবে চলে গেছে। অথচ সরকারি অফিসে যা দেখেছি, তার অনেক কাজই আমার পক্ষে অনায়াসে করা সম্ভব। চেয়ারে বসা লোকগুলির চেয়ে আমার যোগ্যতা কিছু কম বলে মনে হয়নি।

তবু বয়স বড়ো ভার। জীবনে কখনো চাকরির ভাবনা ভাবতে হয়নি, এখন হচ্ছে। বেসরকারি চাকরির বিজ্ঞাপনেও সর্বোচ্চ বয়সসীমা, আমার তা-ও অতিক্রান্ত। পঞ্চাশ বা তদুর্ধ্ব বয়সের কাউকে চাওয়া হয় বলে কোথাও দেখিনি।

আরো বিপদের কথা, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা বলার মতো কিছু নয়। ঠেকেঠুকে বাণিজ্য বিভাগে কোনোমতে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলাম, তখন বয়স চব্বিশ। ইন্টারমিডিয়েটের পর কয়েক বছর কিছুই করিনি, তাই রে নাই রে নাই করে দিন কাটছিলো। বাপের তাড়া খেয়ে বিকম দিলাম প্রাইভেটে। পাশ একটা দিতে হয়, তাই দেওয়া। কখনো সে বিদ্যা কাজে লাগেনি, দরকারও পড়েনি। আর এ দেশে পঠিত বিদ্যার সঙ্গে মিলিয়ে পেশা হয় ক'জনের? এককালের অনেক বন্ধুদের দেখি বায়োকেমিস্ট্রেতে বা বাংলা সাহিত্যে বা মাস্টার্স করে ব্যাংকের অফিসার হয়েছে, ইতিহাসের এমএ হয়েছে পল্লী বিদ্যুতায়নের চাকুরে, রসায়নের ছাত্র সংবাদপত্রের ক্রাইম রিপোর্টার।

আরেক দল আছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিলো বোধহয় এইসব মানুষের জন্যেই। ব্যাংকের কেরানি হওয়ার যোগ্যতা ছিলো না, এমন লোকও এখন ব্যাংকের মালিক। গোরুর হাটের ইজারাদার ইন্ডেন্টিং ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে উঠলো, কয়েক বছরের ব্যবধানে।

মাঝে মাঝে ভাবি, করিৎকর্মা মানুষদের দলে আমি শামিল নই বলে অথবা টাকাপয়সা নিয়ে বিপর্যয়ের কারণে এইসব চিন্তা হয়তো আমার ঈর্ষা বা তিক্ততাপ্রসূত। অক্ষমের অভিমান হলেও হতে পারে। খুব ভেবে নিজের কাছে সর্বাংশে সৎ থেকে জানি, তা নয়। এটাই আসলে বাস্তবতা। শেষ কথা হয়তো এই, তাদের যোগ্যতা ছিলো, তারা পেরেছে। কীভাবে, ন্যায় না অন্যায় তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আমারও ভাবার দরকার নেই। কোথাও ঘাটতি ছিলো, তাই আমার হয়নি। জীবন ও বউ-বাচ্চা নিয়ে সংসার সচল রাখা এখন আমার একমাত্র কাজ। যতোটা ভালোভাবে সম্ভব। বাস্তবতা স্বীকার করে নেওয়া জীবনের খুব বড়ো শিক্ষা, অনেককিছু তখন সহজ হয়ে যায়।

অবস্থা বুঝে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া বিদ্যার হাতেখড়ি বাল্যকালেই হয়েছিলো। নিজের ইচ্ছায়, তা বলতে পারি না। আমার বাবা ফজলুর রহমান বড়ো চাকুরে ছিলেন। একটা আন্তর্জাতিক সংস্থার হয়ে জীবনের বেশিরভাগ সময় দেশের বাইরে কাজ করেছেন, দেশে-বিদেশে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীদের সঙ্গে বিস্তর ওঠাবসা। অথচ গ্রামের বাড়িতে গেলে তিনি সেই পুরনো ফজলা। বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ, পরিচিতি সব বিষয়ে গ্রামের মুরুব্বি বা বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর কোনো তুলনা চলে না। ফজলা তখনো পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে টুয়েনটি নাইন খেলতে বসে যাচ্ছেন, খেয়াজাল নিয়ে মাছ ধরতে নামছেন। কোনো গোলমালে-সংকটে সাধ্যমতো পরামর্শ দিচ্ছেন। কারো মেয়ের বিয়েতে টাকার জোগাড় হয়নি তো ফজলা আছে কী করতে?

কারো ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী, গোরুর গাড়িতে খড়ের ওপর কাঁথা বিছিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে নিলেন। গ্রামে এসে বন্ধুর মৃত্যুর খবর পেয়েছেন, বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তার বউ-ছেলেমেয়ের সঙ্গে বসে কাঁদলেন।

এইসবের মধ্যে তাঁর কোনো ভাণ ছিলো বলে কখনো মনে হয়নি, হৃদয়বান মানুষ তিনি। বলতেন, একদিন বন্ধু তো চিরদিনের বন্ধু।

তবু একটা বিষয়ে তিনি নিজের তৈরি নিয়ম ভেঙে ফেললেন। বোঝা গেলো, স্ত্রী চিরদিনের না-ও হতে পারে। কে জানে, বন্ধু আর বউ হয়তো এক সমতলে বসে না।

আমার মা জমিলা বেগম পুরোদস্তুর গ্রামের মেয়ে। যৎসামান্য লেখাপড়া গ্রামের পাঠশালায়। গাঁয়ের ছেলে ফজলার সঙ্গে তার বিয়ে হলো তেরো বছর বয়সে। ফজলা তখন শহরে বিএ ক্লাসের ছাত্র, বিয়ে করেই চলে গেছেন শহরে, আরো বিদ্যা অর্জন করতে। মায়ের নতুন বসত শ্বশুরবাড়িতে হলেও পশ্চিম পাড়ায় বাপের বাড়িতে নিত্যদিনের যাওয়া-আসা। বুঝতে শেখার বয়স হলে মাকে বলতে শুনেছি, কপাল ভালো হামার ভিন গাঁয়োত বিয়া হয়নি। হলে না জানি কী হলো হিনি।

বাবা ছুটিছাটার সময় গ্রামে আসতেন। এমনিতেও মাঝে মাঝে হঠাৎ দু'একদিনের জন্যে আসতেন শুনেছি, সেসব আমার জন্মের আগের কথা। কলেজ পাশ হয়ে গেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলেন বাবা, এই সময়ে মায়ের কোলে আমার অবতরণ। ভালো ছাত্র ছিলেন, যথাসময়ে ভালোভাবে পাশ করে জীবনের প্রথম চাকরি হলো সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরে, তিনি ঢাকায় গেলেন। মাস কয়েকের মধ্যে বাসাবাড়ি ঠিক করে আমাদের নিতে এলেন।

মাকে বললেন, দুই ঘরের বাসা নিয়েছি, রান্নাঘর আলাদা। তোমার সংসার এখন তুমি গুছিয়ে নাও। একটা খাট ছাড়া আর তেমন কিছু কিনিনি, তোমার পছন্দমতো কিনবো।

বাবা বিস্মিত হয়ে জানলেন, মা যেতে চায় না। শহর সম্পর্কে তার এক ধরনের ভীতিই ছিলো বলা যায়। বাপ-মা বিয়ে দিয়েছে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সেখানে কিছু ছিলো না। তখন শহরে যাওয়ার কথা তো হয়নি। বাবা নিশ্চয়ই বলেছিলেন শহরে সংসার করার কথা, খুব একটা বিশ্বাস হয়তো হয়নি। সত্যি সত্যি সময় এসে গেলে তার বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। কী করে মানুষ শহরে থাকে? সেখানে আত্মীয়-পরিজন বলতে কেউ নেই, চেনাজানা রাস্তাঘাট নেই একা একা ইচ্ছেমতো ঘোরার। কোথায় পুকুরের ঘাটলা, তেঁতুলতলার ছায়া? স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার করা দরকার ঠিকই, সকাল-বিকাল বাপের বাড়ি একবার ঘুরে আসা কম জরুরি? বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান জমিলা বেগম। বললো, হামি গেলে বাপ-মাওক কে দেখপে?

বাবা বললেন, তা বুঝলাম। কিন্তু আমাকে দেখে কে? আমার কী হবে? ছেলের লেখাপড়া?

প্রথম দুটো প্রশ্নের উত্তরে হয়তো কিছু বলার ছিলো না, শেষেরটার উত্তর দিতে সক্ষম হয় মা, গাঁয়োত ইসকুল আছে।

তা আছে। কিন্তু ওকে আমি শহরে নিয়ে পড়াতে চাই। শহরে আমার নিজের কেউ ছিলো না বলে গাঁয়ের স্কুলে পড়েছি। ওর বাবা শহরে আছে, ও এখানে পড়বে কেন?

মা নিরুত্তর। মুখ নিচু করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে মাটি খোঁটে। পারলে ওই কায়দায় বড়োসড়ো একটা গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে লুকিয়ে পড়ে।

বাবা বুঝিয়ে বলেন, ছুটিছাটায় আসবো আমরা। এটা আমারও গ্রাম, আসতে তো হবেই।

মা যেন ঠিক করেই রেখেছে, কোনো কথা কানে তুলবে না। উত্তরও দেবে না। পিঠে হাত বুলিয়ে বাবা বোঝায়, সে বুঝবে না। সামান্য কড়া কথা বললে কেঁদে দেয়। বাবা শেষমেশ বলেন, এবার তাহলে শহরে গিয়ে আরেকটা বিয়ে করে ছেলেকে নিয়ে যাবো। ওকে গাঁয়ে মানুষ করতে চাই না।

মা তখন কেঁদে বুক ভাসায়, ছাওয়াল তো হামার!

বাবার ছুটি শেষ হলেও মীমাংসা হয় না। নিরাশ হয়ে বাবা ফিরে চলে গেলেন। আসা-যাওয়া কমতে লাগলো। রাজশাহী তবু কাছের শহর ছিলো, ঢাকা আরো দূরের পথ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে রোজা-পূজা-ঈদ-পরবের লম্বা ছুটি থাকে। গরমকালে আম-কাঁঠালের ছুটি। কিন্তু চাকরিতে সারা বছরে হাতে গোনা ছুটি, যখন-তখন নেওয়াও যায় না। উপায় কী?

এগুলো সব মায়ের কাছে শোনা, আমার মনে থাকার কথা নয়।

বাবা আরেকবার বিয়ের কথা হয়তো বলেছিলেন কৌশল হিসেবে। মায়ের ওপর চাপ দেওয়ার জন্যে। আমার তাই মনে হয়। তবে দ্বিতীয় বিয়ে তিনি করলেন আরো পাঁচ বছর পরে, চাকরি নিয়ে বিদেশে যাওয়ার আগে আগে। কাউকে কিছু জানাননি আগে থেকে। খবর না দিয়ে হঠাৎ একদিন গ্রামের বাড়িতে এসে উপস্থিত। দাদা তখনো বেঁচে, নিজের মুখেই তাঁকে জানালেন বাবা। দাদা মনে হয় পছন্দ করেননি। বলেছিলেন, ব্যাটা ছাওয়াল, সাহস কর্যা বিয়া করবার পারলেন, বউ সাথে আনলে হলো হিনি।

মায়ের কাছে এসে বাবা বললেন, আমার আর কী করার ছিলো? গাঁয়ে বউ-ছেলে থাকবে, শহরে আমি একা পড়ে থাকবো, এইভাবে হয় না। তোমাদের জোর করে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু জবরদস্তি করা আমার স্বভাব নয়। এতো বছর অপেক্ষা করেও তোমার সঙ্গে সংসার করা হলো না। তোমাকে দোষ দিই না, হয়তো আমারই ভুল। আমি তখন রাজি না হলে বিয়েটা হতো না। অনেকদিনের জন্যে বিদেশে চলে যাচ্ছি বলে এখন বিয়ে না করে আর উপায় ছিলো না। দেশের মধ্যে ঢাকা শহরেই তোমাকে কখনো নিয়ে যেতে পারলাম না, বিদেশে যাওয়ার কথা তুমি হয়তো স্বপ্নেও ভাবো না।

সতীনের কথায় মায়ের চিৎকার দিয়ে কাঁদার কথা, অথবা চুপ করে যাওয়ার কথা, কিন্তু খুব শান্ত গলায় মা জিজ্ঞেস করে, হামার কথা তাঁই জানে?

হ্যাঁ। লুকাবো কেন? আমি কোনো কথা লুকাই না, মিথ্যা বলাও আমার স্বভাব নয়।

কী কলো তাঁই? হামাক তালাক দিবার কয়নি?

না, বলেনি। তবে তুমি চাইলে দিতে পারি। জামালের জন্যে চিন্তা করতে হবে না। তুমি এই সংসারে থাকো বা আলাদা হয়ে যাও, ছেলের দায়িত্ব আমার। মাসে মাসে তোমাদের খরচের জন্যে টাকা আসবে।

মা চুপ করে থাকে।

বাবা বলেন, এক্ষুণি উত্তর দিতে হবে না। ভেবেচিন্তে ঠিক করো। এ বাড়িতে থাকতে চাইলে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না, আমার স্ত্রীর মর্যাদা নিয়েই থাকবে। তবে যদি মনে হয় তুমি নতুন করে জীবন শুরু করবে, তাতেও আমার আপত্তি নেই। তুমি আমার ছেলের মা, তোমাকে কখনো অসম্মান করিনি, করবোও না। এইটুকু বিশ্বাস কোরো।

বিশ্বাস না করার কারণ ছিলো না, বাবা ভুল কিছু বলেননি। তবে বড়ো হয়ে আমার ধারণা হয়েছে, এরকমই হয়তো নিয়তি ছিলো। শহরে সংসার করতে না গিয়ে মা শুধু বাবার দ্বিতীয় বিয়ের একটা উপলক্ষ তৈরি করে দিয়েছিলো। বিশুদ্ধ গ্রামের মেয়ে আমার মায়ের শিক্ষা-দীক্ষা, চলন-বলন সবকিছু বাবার বিশাল ক্যারিয়ারের সঙ্গে কখনো মানানসই হতো না। অকার্যকর হওয়ার সব উপাদান তাদের বিয়েতে ছিলো একেবারে গোড়া থেকেই।

বাবা কথা রেখেছিলেন, তিনি আমাদের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কখনো করেননি। কিন্তু আমার বেড়ে ওঠার বয়সে বাবাকে কাছে পাওয়া হলো না, এই দুঃখও আমার কোনোদিন যাবে না। টাইফয়েডে মায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর আমি চাচা-চাচী ও ততোদিনে প্রায় চলৎশক্তিহীন দাদার কাছে থেকে যাই। তখন আমার বারো বছর, আমাকে নিতে কেউ আসেনি। বাবার পাঠানো মানি অর্ডার নিয়মমতো এসেছে, কখনো ভুল হয়নি। ছুটিতে বাবা দেশে এলে গ্রামে এসেছেন। আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ওঠেনি। ততোদিনে তাঁর নতুন সংসারে আরেকটি পুত্রসন্তান এসে গেছে। কিশোর বয়সী আমার নিজেকে তখন বাড়তি উচ্ছিষ্ট না ভাবা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। চাচা-চাচী যথাসম্ভব করেছে, দাদা তখন থেকেও না-থাকা। মনে হতো, আমার কেউ নেই। অনেকদূরে কোথাও বাবা আছেন, কিন্তু নেই। অনেকটা তাঁর নিজের ইচ্ছায়। মা আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে, তা কি ইচ্ছায় না অনিচ্ছায়?

নতুন মা ও আমার অচেনা ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিন স্পষ্ট মনে আছে। আমি তখন ক্লাস টেনে। দুই মাইল দূরে স্কুল, হেঁটে যাওয়া-আসা করি। পড়ায় মন নেই, যেতে হয় তাই যাই। ঘরে ফিরে আসি, তা-ও আসতে হয় বলে। কোনো কোনোদিন স্কুলে যাওয়ার নাম করে নদীর ধারে শ্মশানঘাটে গিয়ে একা একা বসে থাকি। ছোটো অপ্রশস্ত নদীতে ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়ি, সেগুলি নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিতে চাই। পারি না, মাঝনদী পর্যন্ত যায় বড়োজোর। আমার দৌড় ওই পর্যন্তই। বাসনা আছে, তা পূরণের সামর্থ্য নেই। নদীর ওপার আমার নাগালের বাইরে থেকে যায়।

শ্মশানে লোকজনের ভিড় থাকে মাঝেমধ্যে। তখন দক্ষিণে আরো কিছুদূর হেঁটে যাই। বড়ো গাছপালা ঘেরা জঙ্গলমতো একটা জায়গা আছে, সেখানে যাই, আপনমনে হাঁটি। গাছতলায় শুয়েবসে থাকি। বেলা পড়ে এলে বাড়ির পথ ধরি।

সেদিন স্কুলে গিয়েছি, আগের দিন শোনা গিয়েছিলো কে একজন আসবে জাদু দেখাতে। জাদুকর তার হ্যাট উল্টেপাল্টে আমাদের দেখায়, ভেতরে কিচ্ছু নেই। শূন্য হ্যাট টেবিলের ওপরে উপুড় করে রাখে। তারপর ভাতের হাঁড়ির ঢাকনা তোলার কায়দায় হ্যাট তুলতেই ভেতর থেকে এক জোড়া সাদা কবুতর বের হয়। আরো নানা ভেলকিতে আমাদের বিস্ময় জাগায়। স্কুলে এতো ছেলে থাকতে একসময় কে জানে কেন জাদুকর আমাকে মঞ্চে ডেকে নেয়। কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে, ইতিহাস বইয়ে তোমার সবচেয়ে প্রিয় কে?

বললাম, সম্রাট শাজাহান।

লোকটা আমাকে চেয়ারে বসিয়ে মুখের সামনে তার হাতের পাঞ্জা ঘোরায়, কীসব যেন বলে। তারপর আর কিছু মনে নেই। পরে সবার কাছে শুনলাম, লোকটা আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলো। যখন জেগেছি, আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তুমি কে বলো তো? আমি উত্তরে বলেছি, সম্রাট শাজাহান!

শুনে বিশ্বাস হতে চায় না। তাই হয় নাকি? কিন্তু ভাবি, ওরা বানিয়ে বলবে কেন? বাড়ি ফেরার পথে মনে হতে থাকে, জাদু হয়তো একেবারে স্থায়ীভাবে কিছু পাল্টে দিতে পারে না। সম্রাট শাজাহান থেকে আবার জামাল হয়ে যেতে হয়, নিস্তার নেই। জাদুকরের ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা অস্থায়ী, না হলে ভালো হতো না মন্দ হতো কে জানে! কারণ, একজনের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত ইচ্ছা আরেকজনের হতে পারে। আমি বাবার কাছে যেতে চাই, কিন্তু বাবা যদি না চায়? জাদুকর তাহলে কার বাসনা পূরণ করবে?

এক জায়গায় দেখি দুই গ্রামের মধ্যে হা ডু ডু খেলা হচ্ছে। অনেক লোকের ভিড়, তার মধ্যে আমারও কোনোমতে জায়গা হয়ে যায়। সন্ধ্যার কিছু পরে ফিরে আসি, তখন চারদিকে অন্ধকার নেমেছে। অথচ আমাদের সারা বাড়ি আলোয় আলো। এই সময়ে আমাদের একটা-দুটো ঘরে আলো থাকে, আজ সব ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। বাড়ির বাইরে বৈঠকখানায় এই সময় কারো থাকার কথা নয়, সেখানেও আলো দেখে উঁকি দিই। একটা চেয়ারে বাবা, পাশে দাঁড়ানো একজন মহিলা আর এক বালক। ইজিচেয়ারে দাদা। কয়েক বছর আগে বাবার এনে দেওয়া ইজিচেয়ারটায় দাদা সবসময় বসে থাকতেন, আজকাল আর বসেন না, বিছানায়ই থাকতে হয়। আজ হয়তো ধরে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মহিলা এবং বালকের পরিচয় আমার জানা। আগে চোখে দেখা হয়নি, এই যা। আমি এক পলক দেখে দরজা থেকে সরে যাচ্ছিলাম। বাবার চোখে পড়ে গেলে ভেতরে ডাক পড়ে।

হাতে বইপত্র দেখে বললেন, কী রে, এতোক্ষণে স্কুল থেকে ফিরলি?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে বাবা নতুন মুখগুলির দিকে তাকিয়ে বলেন, এই হলো জামাল। আর জামাল, এই হলো তোর ছোটো মা আর ভাই। এর নাম সুমন।

নতুন মায়ের দিকে তাকাই। ফরসা, সামান্য লম্বাটে মুখ। হাসি হাসি মুখ দেখেও ঠিক বোঝা যায় না, আমাকে পছন্দ করছেন কি না। পরনের শাড়ি দেখলে বোঝা যায়, দামি। এই ধরনের কোনো শাড়ি আমার মায়ের ছিলো না। আমাকে হাত ধরে কাছে টেনে নিলে শরীরে এক ধরনের সুবাস পাই, তা-ও আমার কাছে নতুন। সুমনের মুখ দেখে তাকে খুব ক্লান্ত লাগে, এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে এরকম মনে হয়।

পরিচয়পর্ব খুব দীর্ঘ হয় না বলে স্বস্তি পাই। নিজের ঘরে ফিরে হ্যারিকেনটা দরজার বাইরে রাখি। অন্ধকার ঘরে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকি। বাবা এসেছেন, আমার খুশি হওয়ার কথা। তাঁর কাছাকাছি থাকতে ভালো লাগে, থাকতেই চাই। বরাবর তাই হয়ে এসেছে। এবারে অন্যরকম, দূরে সরে থাকতেই ভালো লাগছে। আগে বাবা গ্রামের বাড়িতে এলে আমি পুরো মনোযোগ পেতাম। এখন আর তা হওয়ার নয়। আমার চোখ ভেজে।

পরদিন সকালে বাবা বললেন, আজ না হয় স্কুলে যাস না, জামাল।

স্কুলে যাওয়া আমার খুব পছন্দের নয়, দ্বিতীয়বার বলার দরকার হয়নি। ছোটো মা-সহ আমাকে নিয়ে বাবা গেলেন মায়ের কবরে। সুমনকে বাড়িতে রেখে যাওয়া হলো। মা মারা যাওয়ার প্রায় দুই বছর পর বাবা প্রথম গ্রামে এলেন। বিদেশ থেকে তৎক্ষণাৎ আসা সম্ভব ছিলো না জানিয়ে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন অবশ্য। মায়ের অনুষ্ঠানাদি আর কবর বাঁধানোর জন্যে টাকাও এসেছিলো যথাসময়ে ও যথানিয়মে। মায়ের কবরে ছোটো মাকে একটুও মানাচ্ছিলো না। এখানে তাঁর কী দরকার? এই মহিলার সঙ্গে মা-র কখনো দেখা হয়নি, আগেই পালিয়েছে মা। তার আত্মসম্মান হয়তো বেঁচেছে, কিন্তু আমার? আমার কথা কেউ ভাবে?

ভাবে না, তা বলি কী করে? এক সন্ধ্যায় আমাকে বসিয়ে বড়োরা সবাই বৈঠকে বসলেন দাদার ঘরে। বাবা, নতুন মা, চাচা-চাচী, বিছানায় শোয়া দাদা। আমাকে নিয়ে কী করা হবে, সেই বিষয়ে কথা। কথা শুরু করলেন বাবা। বছর তিনেকের মধ্যে তাঁর বিদেশের চাকরির মেয়াদ শেষ হবে, তখন ঢাকায় ফিরে আমাকে নিয়ে যাবেন নিজের কাছে। ততোদিনে আমার ইন্টারমিডিয়েট শেষ হয়ে যাবে।

আমার মনে হয়, ইন্টারমিডিয়েট পড়াটা কোথায় হবে? গাঁয়ের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ সম্ভব, কলেজ কোথায়? কাছাকাছি কলেজ কমপক্ষে দশ মাইল। আমি কিছু বলি না, চুপ করে শুনি। প্রশ্নটা কেউ করে না। চাচা কিছু বলবেন না, জানা কথা। বড়ো ভাই যা বলবেন, তাতে সায় দেওয়ার বেশি কিছু করারও নেই তাঁর। আপত্তি করলে, প্রশ্ন তুললে বড়ো ভাই ভাবতে পারেন, বোঝা নামানোর জন্যে বলা। শুধু দাদা একবার বললেন, অক বিদেশোত লিয়া যাওয়া যায় না?

ছোটো মা বললেন, তা কিন্তু হতে পারে। ও দেশে তো চেনাজানা মানুষ বিশেষ কেউ নেই। সুমনের একটা বড়ো ভাইও থাকলো।

বাবা সংক্ষেপে জানালেন, অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা, তা ব্যাখ্যা করলেন না। কেউ আর কোনো প্রশ্নও করে না।

আমার আর্তি কেউ শুনতে পায় না। একা আমিই জানি। সবটাই সাজানো নাটকের মতো লাগে। বাবা আর ছোটো মা-র কথাগুলো আগে থেকেই সাজিয়ে আনা মনে হয়। অভিনয় নিখুঁত হয়েছে। প্রকাশ্যে নয়, মনে মনে হাততালি দিই।

চারদিন পরে অতিথিরা বিদায় নিলেন। নতুন দু'জন অতিথিই, বাবাও এবারে তার চেয়ে বেশি কিছু না। হয়তো আমি অন্য চোখে দেখছিলাম বলে এরকম লাগে।

তিন বছর নয়, বাবার ফিরতে লেগে গেলো প্রায় ছয় বছর। যুদ্ধ একটা কারণ, ফিরলেন বাংলাদেশ হওয়ার কিছু পরে। যুদ্ধের সময়টা আমার কাটে দিনমান তাস খেলে। স্নানাহার ও রাতে ঘুমের জন্যে বিছানার প্রয়োজন না হলে বাড়িতে আর আসে কে! আমাদের পাহুনন্দা গ্রাম সীমান্তের কাছে, মিলিটারি হামলার আশংকা হলে সাইকেলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অন্যদেশের সীমানায় ঢুকে পড়া যায়।

যুদ্ধের প্রায় পুরোটা সময় আমাদের বাড়ি লোকজনে ভরা থাকতো। দলে দলে মানুষ শহর থেকে, অন্যসব গ্রাম থেকে পালিয়ে আসছে। ওপারে যাবে। তার মধ্যে একদিন-দু'দিন থাকার মতো অচেনা অপরিচিত মানুষ যেমন আছে, আত্মীয়-স্বজনও কম নয়। তাদের অনেককে আগে কোনোদিন দেখিনি। আত্মীয়দের অনেকে ওপারে শরণার্থী শিবিরের বদলে আমাদের সঙ্গেই থেকে যায় স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে। পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের ঘরে ফেরে, পাহুনন্দায়ও আর নিরাপদ মনে না হলে ওপারে রওনা হয়ে যায়। একেক বেলায় তখন চল্লিশ-পঞ্চাশজনের রান্না হয় বাড়িতে।

এক ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে বাড়ি ফিরছি। রাত একটু বেশিই হয়েছে। পা টিপে সাবধানে আমার ঘরের দাওয়ায় উঠেছি। আমার ছোটো ঘরটিতে আমি একা থাকি, ঘরে যাতায়াতের জন্যে মাঝখানে সামান্য জায়গা ছেড়ে দাওয়ার দুই পাশে অনেক মানুষ পাটি পেতে চাটাই পেতে ঘুমায়। এই অন্ধকারেও কারো গায়ে পা না দিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কায়দা ততোদিনে শিখে গিয়েছি। কপাটের শিকল নামিয়ে ঘরে ঢুকেছি, মনে হলো কেউ একজন যেন আমার পেছনে এসে ঢুকলো।

বুঝে ওঠার সময় পাওয়া যায় না, তার আগেই দরজায় খিল পড়ে গেছে। দরজা বন্ধ করার কাজটা আমার নয়, তা নিশ্চিত জানি। অন্ধকারে কেউ একজন আমাকে জাপটে ধরে। বুঝতে সময় লাগে না, শরীরের মালিক পুরুষ নয়। কোন কোন বৈশিষ্ট্য দিয়ে নারীশরীর চেনা যায় তা জানা আছে। কিছু বলার আগেই জীবনের প্রথম চুম্বনে মুখ আটকে যায়। নীরব সম্মতিতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন জাগ্রত দুই শরীর। পরিধেয় অপসারণ, উন্মোচন ও উদঘাটন পর্বের পর শরীরে শরীর মিলিয়ে দেওয়া। আনাড়িপনা বা অতিরিক্ত অস্থিরতায় আমি সমাপ্ত হই অবিলম্বে। তৎক্ষণাৎ সশব্দ একটি চড় আমার গালে নেমে আসে, সজোর ধাক্কায় আমি বিছানায় কাৎ হয়ে পড়ি। অন্ধকারে শুধু টের পাই, অপর শরীর দরজা খুলে দ্রুত অপসৃত হয়েছে।

পরদিন সকালে অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি সময় বাড়িতে থাকি। বাড়িভরা মানুষজনের মুখ দেখি। কাল রাতে আমার ঘরে কে এসেছিলো বোঝার চেষ্টা করি। কোনো নারীমুখে কোনো ছায়া দেখি না। তার পরিচয় চিরদিন রহস্যে থেকে যায়, আমার কোনোদিন জানা হয়নি।

বাবা দেশে ফেরার দুই বছর আগে ইন্টারমিডিয়েট শেষ হয়েছে। ম্যাট্রিকের পরে নওগাঁয় বাবার এক দূর সম্পর্কের ভাইয়ের বাসায় থেকে বি টি কলেজে আমার পড়ার ব্যবস্থা হয়। চক এনায়েত পাড়ার খুব কাছে কলেজ, পাশে মুক্তি সিনেমা হল। আরেকটু হেঁটে শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া নদীর ওপরের ব্রিজ পার হলে তাজ সিনেমা। আর কী চাই? বাবার হোটেলে না থাকি, বাবার পয়সায় বন্ধুদের খাওয়াতে, সিনেমা হলে দেদার খরচ করতে কোনো অসুবিধা নেই।

দেশে ফিরে বাবা এলেন আমাকে নিতে। ঢাকায় আসা হলো। নতুন দেশের নতুন রাজধানীতে আমি নতুন আগত একজন। বাড়িতে আরেকজন নতুন আমার আগেই উপস্থিত হয়েছিলো। সুমনের দুই বছর বয়সী বোন। সুখী।

মগবাজার আর ধানমণ্ডিতে অবাঙালিদের ফেলে যাওয়া দুটি বাড়ি বাবা শস্তায় কেনেন। মগবাজারের বাড়ি ভাড়া দিয়ে ধানমণ্ডিতে থাকা। বড়ো দোতলা বাড়ি, ওপরে দুই বাথরুমসহ চারটা বেডরুম, সামনে পেছনে দুই ব্যালকনি। নিচে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, ড্রইং, ডাইনিং। সামনে প্রশস্ত লন, পেছনে কাজের লোকজনদের থাকার ব্যবস্থা। একপাশে দুই গাড়ি-সমান গ্যারাজ, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠলে তার ওপরে ড্রাইভারের থাকার ঘর।

সদ্য গ্রাম থেকে এসে এইসব দেখেশুনে কিছু ভ্যাবাচ্যাকা লাগে। এরকম বাড়ি জীবনে চোখেও দেখিনি। শহর দেখার মধ্যে দেখেছি নওগাঁ, আর সেখানে থাকার সময় এক বন্ধুর সঙ্গে ট্রেনে বগুড়া। ঢাকার তুলনায় সেগুলি খেলনা শহর। এতো মানুষজনও জীবনে দেখিনি। নতুন অনেককিছু শিখতে বুঝতে হচ্ছিলো। বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে আমার দূরত্ব বুঝতে সময় লাগে না।

ছোটো মা কোনোদিন সামান্যতম দুর্ব্যবহার আমার সঙ্গে করেছেন, এমন কথা বলতে পারি না। খাবার টেবিলে নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়ে আমার পাতে কম দেননি কখনো। সুমন-সুখীর জন্যে জামাকাপড় কেনা হলে আমার জন্যেও হয়েছে। তবু কোথায় যেন কী একটা নেই, হয়তো তাঁর ব্যক্তিত্বই ওরকম, খুব কাছে যাওয়া যায় না। ছোটোবেলায় বাবা গ্রামে গেলে তাঁকে সারাক্ষণ কাছে পাওয়া যেতো। এক বাড়িতে বসবাস করতে এসে হয়তো সেরকম মনোযোগ তাঁর কাছে আশা করেছিলাম। কিন্তু বাবার কর্মজীবনের ব্যস্ততা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিলো না। বড়ো চাকরির দায়িত্ব বড়ো, আমি তার কিছু জানতাম না। ফলে, ছুটির দিন ছাড়া বাবার সঙ্গে তেমন দেখাও হয় না।

ওপরতলায় বড়ো বেডরুমে বাবা এবং ছোটো মা থাকেন। আরেক ঘরে সুমন-সুখী। প্রথমদিন ছোটো মা সারা বাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন ঘর চাও? ওপরে নিচে যেখানে তোমার পছন্দ।

আমি বেছে নিয়েছিলাম নিচের তলায় কোণের ঘরটি। তখন অন্তত কিছুদিন হয়তো আমি সবার কাছ থেকে একটু দূরে থাকতে চেয়েছিলাম। সত্যি সত্যি সবার চেয়ে একটু দূরেরই আমি। কিন্তু নিজের ঘরে স্থায়ী হওয়ার পর মনে হতে থাকে, আমি বাইরের একজন। ওরা সবাই ওপরে থাকবে, আমি নিচে। এরকম মনে হওয়ার যুক্তি ছিলো না জানি, তবু ওই বোধটাও সত্যি। মানুষের মন যে কী বিচিত্রভাবে কাজ করে! কিছু আহরিত ও কিছু বানিয়ে তোলা দুঃখের মিলিত পাহাড় তৈরি হয় এইভাবে।

সময় যায়, ঢাকা শহরের সঙ্গে পরিচয় বাড়ে, বন্ধুবান্ধব হয়। বন্ধুরা কেউ কলেজে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। কলেজের খাতায় আমার নাম আছে, ক্লাসে যাই না। ইচ্ছে করে না। রাতে ঘুমানোর সময় ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীফ মিয়া, লাইব্রেরি পাড়া আমার স্থায়ী ঠিকানা। হাতখরচের পয়সা যথেষ্ট পাই, কিছু নবাবিও করা চলে। আমি কী করি, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে সেসব খবর নেওয়ার কারো দরকার হয় বলে মনে হয় না। বাবা সারাদিনমান কাজকর্ম নিয়ে ছুটছে। ছোটো মা-ও এক কলেজে মাস্টারি করেন, বাকি সময় সংসার ও ছেলেমেয়ের তদারকি নিয়ে থাকেন।

আমি তাঁর নিজের ছেলে হলে সময় হতো কি না, কে জানে! আমার অবশ্য তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আমি আছি আমার মতো। রাতে দেরি করে ফিরলেও কেউ কিছু বলে না, হয়তো সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার জন্যে টেবিলে খাবার রাখা আছে। প্রায়ই খাওয়ার ইচ্ছে থাকে না, একা ডাইনিং টেবিলে বসা যায়! খুব খিদে থাকলে ঠাণ্ডা ভাতই খেয়ে নিই, কাজের লোককে ডেকে গরম করতে বলা যায়। কে করে?

কীভাবে কে জানে, বাবা জানলেন আমি কলেজে যাই না। ডেকে শুকনো গলায় বললেন, কলেজের খাতায় তো নাম কাটা গেছে। প্রাইভেটে বিকম দিয়ে দে।

আমার সাধ্য কী আদেশ অমান্য করি! পরীক্ষা দিলাম, পাশও হলো। কায়ক্লেশে।

রিনির সঙ্গে দেখা এইরকম সময়ে। বাড়ির কাছে ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার, সোভিয়েত কালচারাল সেন্টারে ছবি দেখানো হয়। যারা এসবের আয়োজন করে, সেই ফিল্ম সোসাইটিগুলিতে আমার ম্যালা বন্ধুবান্ধব। দুটোর মেম্বারও হয়েছিলাম। টিকেট হাতে আসে নিয়মিত। এইরকম একটা ছবির শো শেষে রিনিকে দেখি। সুন্দরী মেয়েকে চোখে না পড়ার কোনো কারণ নেই। আলাপ করতে চাইলে অজুহাতের অভাব হয় না। সুতরাং অবিলম্বে পরিচয়, প্রণয়। আমার বাবা বউ জীবিত থাকা অবস্থায় আবার বিয়ে করেছেন, সুতরাং সেই বাপের ছেলের সঙ্গে রিনির বাবা-মা মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি নন। কোর্টে রেজিস্ট্রি না করে উপায় থাকে না। এখন ভাবলে কিছু আশ্চর্য লাগে, রিনির সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে টিকবে না, তাঁরা কি আগেই বুঝেছিলেন? কী করে? কিন্তু তাঁদের আপত্তির কারণ তো ছিলো আমার বাবার দুই বিয়ে, জামাই হিসেবে আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতা নয়। তাঁদের কি জানা ছিলো, পিতার পথ পুত্রও অনুসরণ করবে?

বাবা ও ছোটো মা কিন্তু কোনোরকম প্রশ্ন বা আপত্তি ছাড়াই বউকে ঘরে নিলেন। এমনকি বাবা নিজে উদ্যোগ নিয়ে রিনির বাবার সঙ্গে কথা বললেন। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে, এখন সবাই মিলে মানিয়ে নিলে সবদিক থেকে ভালো হয়।

কাজের কাজ কিছু হলো না। বাবা শ্বাস ফেলে বললেন, আমার চেষ্টা করার দরকার ছিলো, করলাম। অন্তত চেষ্টা না করার অনুশোচনা আমার হবে না কখনো।

রিনির সঙ্গে ছোটো মা-র বেশ জমে গেলো। অসমবয়সী সখীর মতো। তাঁকে আর অতো দূরের মানুষ বলে মনে হয় না। বাবারও দেখি রিনি ছাড়া কোনো কথা নেই। ভাবীর ভক্ত হতে সুমন-সখীর বেশি সময় লাগে না। অবস্থা এমন যে আমিই তখন রিনির সবচেয়ে দূরের মানুষ। ঈর্ষা হয়, আর সবাইকে নিয়ে সে ব্যস্ত, আমিই তাকে একা যথেষ্ট পাই না। ঈর্ষার মধ্যে কিছু গর্বও থাকে, বউটা তাহলে খারাপ আনিনি। নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি।

ভাবি, আমার মা বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে রিনির সম্পর্ক কেমন হতো! ভাবনা একটা ঝলকের মতো দেখা দেয়, বেশিক্ষণ থাকে না। রঙিন স্বপ্নের মতো সুখের দিনে মানুষের যেমন হয়, তখন সব না-পাওয়া ও অতৃপ্তি খুব সুদূর লাগে, প্রিয় মানুষের না-থাকাও বড়ো হয়ে থাকে না। বিয়ের পরের কয়েকটা মাস সম্ভবত আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় ছিলো।

সুখের দিন স্বল্পকালের হয়। স্কুলে দেখা জাদুকরের কথা মনে পড়ে। আমাকে নিমেষে সম্রাট বানিয়ে দিয়েছিলো একবার। এ-ও জাদুবলে সম্রাট শাজাহান বনে যাওয়ার মতো ক্ষণকালের স্বপ্নপূরণ।

বাবা একদিন বললেন, এখানে তোরা আছিস, তাতে সত্যিই অসুবিধা কিছু নেই। কিন্তু এখন তোর নিজের জীবনের দায়িত্ব নেওয়ার সময় হয়েছে। কী করবি, কিছু ভেবেছিস?

আমি কিছু ভাবিনি। এতো বয়স পর্যন্ত সবসময়ই কারো না কারো দয়ায় এবং ছায়ায় আমার সময় গেছে। ছোটোবেলা থেকে পরগাছা হয়ে আছি, আমার নিজের কিছু নেই। কীসে যোগ্য তা যাচাই করা হয়নি। এসব ভাবতে হবে, তা-ও শিখিনি। কেউ শেখায়নি। আমি উত্তর না দিয়ে বাবার দিকে তাকাই।

বাবা বলেন, আমি চিরকাল থাকবো না। তোর নিজের একটা পরিচয় হওয়া দরকার। নিজের পেশা, নিজের সংসার, ভবিষ্যৎ এইসব ভাবতে হবে। চাকরি-বাকরিতে তোর খুব সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। ভেবে দেখ, কোনো একটা ব্যবসাপত্র করতে পারিস কি না। আগে যেহেতু করিসনি, খোঁজখবর করে কারো সঙ্গে পার্টনারশীপে কিছু একটা করা মনে হয় ভালো হবে। পার্টনারের সঙ্গে থেকে কাজটা শিখতেও পারবি। পুঁজির ব্যবস্থা আমি দেখবো। তবে একটা কথা, টাকা কিন্তু একবারই পাবি। লোকসান দিয়ে পরে আবার টাকা চাইতে আসবি, তখন আমার না করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কারণ অফুরন্ত টাকা আমার নেই। সুতরাং যা করবি, সময় নিয়ে ভেবেচিন্তে বুঝেশুনে।

সময়টা সঠিক ছিলো মনে হয়। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা সিদ্দিক, আশরাফ আর তপন একটা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস করার চেষ্টায় আছে। ঢাকা শহরে তখন অফসেট প্রেস হাতে গোনা। আমি তাদের চতুর্থ পার্টনার হওয়ার প্রস্তাব দিলে তাদের সাগ্রহ সম্মতি পাওয়া যায়। বস্তুত, ব্যাংকের লোন নেওয়ার জন্যে তাদের যে পরিমাণ পুঁজি দেখাতে হবে, সেখানে কিছু ঘাটতি ছিলো। আমার কাছ থেকে টাকা এলে তা আর সমস্যা থাকে না। সত্যি যে এই ব্যবসা সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র ধারণা নেই। সেই সময়ে কোনোকিছুরই কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিলো না। ভরসার কথা, আশরাফের পৈত্রিক ব্যবসা ছিলো প্রকাশনা, সেই সুবাদে ছাপাখানার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একটি প্রেসে কাজ করার অভিজ্ঞতা সিদ্দিকের হয়েছিলো। তপন ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে, সাধারণ ব্যবসাবুদ্ধি ও তা পরিচালনার ধারণা তার ভালোই আছে।

আনাড়ি বলতে এক আমি। তারা ভরসা দেয়, অতো চিন্তার কী আছে? বুঝে নিতে কোনো সময়ই লাগবে না দেখিস।

বাবা আমার বন্ধুদের সঙ্গে নিজে কথা বলে সন্তুষ্ট হয়ে অনুমোদন দিলেন। প্রতিশ্রুতিমতো পুঁজির টাকাও। একই সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে জানালেন, মগবাজারের বাড়িটি আমাকে লিখে দেওয়া হয়েছে। তাঁর ইচ্ছে রিনি এবং আমি আলাদা সংসার শুরু করি অবিলম্বে। ভাড়াটেদের নোটিস দেওয়া হয়েছে, বাড়ি খালি হয়ে যাবে এ মাসের মধ্যেই। কারণ জানা গেলো, বাবাকে আগামী মাসে আবার দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে কয়েক বছরের জন্যে। ধানমণ্ডির বাড়িটি দু'জন মাত্র মানুষের জন্যে বেশি রকমের বড়ো, তা আমাদের স্বস্তির চেয়ে অসুবিধার কারণই বেশি হবে। এই বাড়ি আপাতত ভাড়া দিয়ে রাখা হবে। বাবা দেশে ফিরলে তখন ভাড়াটে তুলে দিয়ে নিজেরা বসবাস করবেন।

ফলে পর পর কয়েকটা বড়ো ঘটনা ঘটে। প্রেসের জন্যে ব্যাংকঋণের অনুমোদন পাওয়া গেলে আমার সম্ভাব্য পেশা ও পরিচয়ের ব্যবস্থা মোটামুটি একটা চেহারা নিতে শুরু করে। বাবা সপরিবারে নতুন কর্মস্থলে চলে গেলেন।

যাওয়ার আগে অতিরিক্ত কিছু টাকার চেক ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ব্যবসার রোজগার ঘরে আসতে অন্তত বছরখানেক তো লাগবেই, ততোদিন তোদের সংসার খরচের জন্যে।

বাবা সবদিকে এতো খেয়াল রাখেন কী করে, কে জানে! মানুষটাকে আমার ঠিক বোঝা হলো না। কখনো এতো কাছের লাগে, আবার কখনো খুব দূরবর্তী ও আপাত-উদাসীন।

ধানমণ্ডির বাড়ির আসবাব তুলে এনে মগবাজারের বাড়ি সাজানো হয়। দরকারের অতিরিক্ত অনেক জিনিসে আমাদের ঘর ঠাসাঠাসি। দোতলা হলেও এই বাড়ি অতো বিশাল ও প্রশস্ত নয়। ওপরে দুই বাথরুম ও আলাদা আলাদা ব্যালকনিসহ দুটি বেডরুম, নিচে একটি বেড ও বাথ, কিচেন, ড্রইংরুম। কোণে ছোটো স্টাডিরুম।

রিনির সঙ্গে সত্যিকারের যৌথজীবন শুরু হতে না হতেই বাড়িতে আরেকজন আসছে জানা যায়। পারুল শুধাইল কে তুমি গো, অজানা কাননের মায়ামৃগ।

আমি জিজ্ঞেস করি, কবে জানলে?

বাবারা যাওয়ার আগে আগে। ইচ্ছে করে তখন বলিনি।

কেন? বললে কী হতো?

রিনি বলে, কেমন করে বলতে হয়, তাই তো জানি না। লজ্জাও করছিলো।

লজ্জার করবে কেন? কী করতে কী হয়ে গেলো, তাই?

নষ্টের গোড়া তুমি। বলে হাসি চাপে রিনি।

অজান্তে রিনি একটা সত্যি কথা বলে ফেলেছিলো। আমি নিজে তখন জানতাম না, জানলে স্বীকার করাও সহজ ছিলো না। আমিই নষ্টের গোড়া। রিনি জানে না, তার কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত আর নই আমি।

শুরুটা কেন কীভাবে হয়েছিলো, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। টাকা দিয়ে মেয়েমানুষের শরীর কেনার রুচি আমার ছিলো না, কিন্তু কিছু কৌশলী হতে জানলে কোনো নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন

কাজ নয় বলে আমার ধারণা জন্মে। কৌশলগুলি আমার আয়ত্বে আসতে থাকে, শিকার-পদ্ধতিতে নৈপুণ্য বেড়ে যায়। অন্য নারীতে আসক্তি মানেই যে রিনির জন্যে ভালোবাসা না-থাকা, তা আমার কখনো মনে হয়নি। দুটোই সমান সত্য। আমার কাছে তখন তা ছিলো শুধুই অ্যাডভেঞ্চার, আরো দখল করতে পারার উল্লাস-উৎসব। মনে হয়, আমিও নিতে জানি, জয় করে নিতে পারি। আমি উপেক্ষিত, আড়ালে পরগাছা হয়ে বেড়ে ওঠা নিঃসঙ্গ ও আত্মবিশ্বাসহীন এক কিশোর আর নই। একজন সম্পূর্ণ পুরুষ। যুদ্ধকালে অন্ধকার এক রাতের সেই রহস্যময়ীর কোনো ভূমিকা ছিলো নাকি? হয়তো ছিলো, আমি জানি না।

বিষয়টা প্রথম আঁচ করে আশরাফ। ততোদিনে সাজিদ জন্মেছে। নাতির জন্মের পর রিনির বাবা-মা পুরনো অভিমান তুলে নিয়েছেন। ছেলে এবং বাপমায়ের সঙ্গে মেরামত হওয়া সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে রিনির সময় কাটে। প্রেস চালু হয়ে গেছে, আমার ব্যস্ততাও বেড়েছে। এক সন্ধ্যায় প্রেসের অফিসঘরে বসে আশরাফের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছি। আড্ডায় মন ছিলো না। কিছু আগে আমার নতুনতম বান্ধবী ফোন করে যেতে বলেছে, আমি উসখুস করছিলাম।

আশরাফ বলে, তুই কিন্তু বাড়াবাড়ি করে ফেলছিস জামাল। জানাজানি হলে খবর আছে। এর মধ্যে বাহাদুরির কিছু নেই। বউয়ের কাছে, প্রেমিকার কাছে অবিশ্বস্ত হতে যে কেউ পারে, তার জন্যে কোনো প্রতিভার দরকার হয় না। শুধু লাগে সামান্য সাহস আর নির্লজ্জ হওয়ার ক্ষমতা।

আশরাফ কিছু গম্ভীর ও নীতিবাগীশ ধরনের, তা আমরা সবাই জানি। তবে তাকে সমীহ না করাও সম্ভব হয় না। প্রসঙ্গ হালকা করার জন্যে বলি, আরে বাদ দে, সিরিয়াস কিছু না।

তা বুঝলাম, কিন্তু যা করে বেড়াচ্ছিস তার কোনো মানেও হয় না।

নিজের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোর জন্যে বলি, আমি রিনিকে অবহেলা করছি না, তাকে আমার জীবন থেকে বাদ দেওয়ার কথাও ভাবি না।

চশমার কাচের পেছন থেকে চোখ দুটি তীক্ষ্ণ করে আমার চোখে তাকায় আশরাফ। বলে, বন্ধু হিসেবে বলি, অন্য কেউ হলে আমার কিছু এসে যায় না। ভেবে দেখেছিস, পৃথিবীর অন্যসব প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য কোথায়?

তাদের কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই, নীতিশাস্ত্র নেই। এই বলবি তো?

যদি বলি, তাহলে কি সেটা খুব ভুল হবে? ধর্ম-অধর্মের কথা তুলছি না। নীতিশাস্ত্রও বাদ দে। কিন্তু কিছু আচার-আচরণের সাধারণ নিয়ম-কানুন মানুষ তৈরি করে নিয়েছে, অন্য কোনো প্রাণীর সেসব দায় নেই। ভালোবাসার মানুষের কাছে বিশ্বস্ত থাকা কিন্তু সেই নিয়মের মধ্যেই পড়ে। ভেবে দেখ, তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তারও কিছু শর্ত আছে, নিয়ম আছে। এক ব্যবসার অংশীদার হিসেবেও কথাটা সত্যি।

আশরাফের যুক্তি ও ব্যাখ্যা মানতে অসুবিধা হয় না, মান্য করা অবশ্য অন্য কথা। আমার ভেতরের অসহায় অপূর্ণ জামালকে সে চেনে না, চেনার কথা নয়। আমি নিজে পুরোপুরি জানি? ঘরের বাইরে নারীসংসর্গ জীবনভর ভালোবাসার কাঙাল আমার বুভুক্ষু না-পাওয়াগুলিকে পরিশোধ করছিলো কি না জানি না। কোনো অন্যায় করছি বলে মনে হয়নি। আশরাফের সতর্কসংকেত অনায়াসে উপেক্ষা করি। যুক্তির চেয়ে নগদ প্রাপ্তির লোভ অনেক বড়ো।

একদিন দুপুরে অফিসে বসে আছি, আচমকা বাবার ফোন।

যা শুনছি, তা কি সত্যি?

কী শুনেছেন?

সাজিদকে নিয়ে রিনি বাপের বাড়ি চলে গেছে এবং আর ফিরবে না বলে জানিয়েছে।

কই, আমি তো কিছু জানি না।

আমাকে আর তোমার ছোটো মাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে। আশা করি তুমি কারণটা জানো।

বাবা জীবনের প্রথম আমাকে তুই ছেড়ে তুমি বলছেন। তাঁর অসন্তোষ খুব পরিষ্কার। কী বলা যায় বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকি।

বাবা বলেন, ওই চিঠির জবাব আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, রিনি অবশ্য জবাব আশা করছে বলেও মনে হয় না। সে নালিশ করেনি, আমাদের সালিশও মানেনি। শুধু তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে লিখেছে, আমরা যেন তাকে ভুল না বুঝি। যা লিখেছে, তাকে তো দোষ দিতে পারি না।

সাজিদের তখনো চার বছর হয়নি। এক ছাদের নিচে বাস করে গোপন বেশিদিন গোপন রাখা যায় না, প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। রিনি কিছু একটা ঘটছে অনুমান করেছিলো বলে ধারণা করছিলাম, আমার দুয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় তথ্য-প্রমাণ-সাক্ষ্য উদ্ধারও ঘটে যায়।

আশ্চর্য লাগে, রিনি আমাকে বিন্দুবিসর্গ কিছু জানায়নি। বাপের বাড়িতে গেছে দিনকয়েক আগে, অল্প কয়েকদিন থাকার মতো প্রস্তুতি নিয়ে, বরাবর যেমন যায়। গতকাল ফোনে যথারীতি ছেলের সঙ্গে কথা হলো, রিনির সঙ্গেও। কোনো আভাস ছিলো না। যাওয়ার আগে-পরে ঝগড়াঝাটি, কথা কাটাকাটি নয়। সুতরাং রিনি যে ভেবেচিন্তে আর ফিরবে না বলে স্থির করে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। মুশকিল এই, অভিযোগ করলে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ থাকে, রিনি সে সুযোগও দিচ্ছে না। অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থন করার কিছু নেই, স্বীকারোক্তি দেওয়া যেতে পারে। তা করতে না হলেই ভালো।

নীলার সঙ্গে আমার তখনো পরিচয় হয়নি। যেসব নারী আমার জীবনে তখন ছিলো, তারা শুধুই আসে এবং যায়, সম্পর্কের বাঁধন বা দৃঢ়তা কিছু ছিলো না। কেউ কেউ দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি ও সম্পর্কের আশা করে, আমার আগ্রহ হয় না। হয়তো অস্পষ্টভাবে আমার ধারণা হয়েছিলো, রিনি থাকবে রিনির মতো, আমি খুঁটিতে বাঁধা প্রাণীর মতো নাগালের মধ্যে যা পাওয়া যায় তার সব আহরণ করে যাবো। বাবার জীবন সামনেই দেখেছি। মাকে রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্যে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন তাঁর হয়নি। আমার মা নিজেকে আলাদা করার কথা ভাবেনি, মেনে নিয়েছিলো। এই দেশে মেয়েরা বরাবর তা-ই করে এসেছে। রিনি আমার খুঁটি উপড়ে দিয়েছে, দড়ি কাটা শুধু বাকি।

যথাসময়ে তা-ও ঘটে। রিনির বড়ো ভাই রশিদের তৎপরতায় কোনো তিক্ততা ছাড়াই বছর দুয়েকের মাথায় বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়। সাজিদ তার মায়ের কাছে থাকবে। আপত্তি করার কিছু ছিলো না, করলেও তা টিকতো না। ছেলে মানুষ করার মতো, বিশেষ করে তার মাকে বাদ দিয়ে, উপযুক্ত বাবা তো আমি নই। চূড়ান্ত হওয়ার আগে রিনির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি, অন্তত ছেলের ভবিষ্যত ইত্যাদি নিয়ে, সে বলবে না। রশিদ ভাই সাজিদের সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা করার ব্যবস্থা করে। একদিন ছেলে জিজ্ঞেস করে, বাবা তুমি আসো না কেন? আমরা বাসায় কবে যাবো? মাকে তুমি ভালোবাসো না?

এই প্রথম আমার বুকে বিষাদের বাতাস ঢুকে পড়ে। সামলে নিতে একটু সময় লাগে। বলি, তোদের দু'জনকেই আমি খুব ভালোবাসি বাবা!

সত্যি বলেছিলাম, হৃদয়ের ভেতর থেকে তুলে এনে। এখন এই এতো বছর পরে জিজ্ঞেস করলেও বলবো। অনেক হোঁচট-ধাক্কা খেয়ে কেন যেন মনে হয়, রিনির সঙ্গে সঙ্গে সব সৌভাগ্যও আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। কাউকে বলা চলে না, নিজের মনে কখনো কখনো ভাবি, রিনি থাকলে কীরকম জীবন হতো?

এতোকিছুর মধ্যেও কর্মক্ষেত্রে আমার মনোযোগ ছিলো অখণ্ড ও একাগ্র। সেখানে ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ আমার নেই। চারজনের যৌথ পরিশ্রমে ব্যবসা মোটামুটি একটা অবস্থানে দাঁড়িয়ে যায়। অসামান্য কোনো সাফল্য নয়, কিন্তু তা আত্মবিশ্বাস ফোটায়।

নীলাকে বিয়ে করা রিনির সঙ্গে ছাড়াছাড়ির চার বছর পর। ততোদিনে রিনির নতুন সংসার হয়েছে, নিউ ইয়র্কে। সাজিদ তার কাছে। খুশি-অখুশি কোনোটাই হওয়ার কথা নয় আমার। তবু কোথাও যে একটু চিনচিনে অনুভব হয়নি, তা বলা কঠিন। দুই বছরের মাথায় নিশি এলো। সাজিদ আমার জীবনের ভেতরে যতোদিন সরাসরি উপস্থিত ছিলো, তার দিকে তেমন মনোযোগ দেওয়া সত্যিই হয়ে ওঠেনি। নিশিকে দিই। সবার জীবনে দ্বিতীয়বার সুযোগ আসে না, আমার এসেছে বলে মনে হতে থাকে।

রিনির সঙ্গে যৌথজীবনে অন্য ধরনের আনন্দ-তৃপ্তি ছিলো। তখন আমার জীবনে বাবার ছায়া অনেক দীর্ঘ। আলাদা বাড়িতে উঠেও এক বউ ছাড়া নিজের বলতে কিছু ছিলো না। এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি, বাবার সহায়তা থাকলেও পরিশ্রমের ফল পেয়ে তাকে নিজের দাবি করা চলে। কাজের সময়ের বাইরে নীলা আর নিশি। ছুটির দিনে একেক দিন একেকজনের বাড়িতে বন্ধুরা সবাই একত্রিত হওয়া, ঢাকার বাইরে ঘুরতে যাওয়া – এইসব হতো। নীলার খুব ছোটোবেলা থেকে শখ ছিলো পূজার মৌসুমে একবার কলকাতায় যাওয়ার। তা-ও হলো, দলেবলে সবাই মিলে।

ঋষির জন্মের কিছুদিন পরে এক অঘটন। তখন অতো বড়ো মনে হয়নি, ভাবা গিয়েছিলো নিতান্তই ভুল। কিন্তু সেই ঘটনা আস্তে আস্তে বিশাল হয়ে ওঠে, তার ছায়া ক্রমশ বড়ো হতে হতে আমার সমস্ত জীবন উল্টে-পাল্টে দিয়ে যায়। এই ছায়ার বাইরে বেরিয়ে আসা আমার আজও হয়নি।

ঢাকায় আন্তর্জাতিক একটা উৎসব সংক্রান্ত যাবতীয় ছাপা ও প্রকাশনার কাজ আমরা পেয়েছিলাম। কাজটা বড়ো এবং সরকারি। নানান গোলযোগে সময়মতো কাজ তুলে দেওয়া গেলো না, তার মধ্যে একটা ছিলো সরকারি দফতর থেকে সময়মতো সব মালমশলার সরবরাহ না পাওয়া। আন্তর্জাতিক উৎসব বলে দেশের এবং সরকারের মান জড়িত। কোনো অজুহাত শুনতে রাজি নয় তারা। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজের প্রাপ্য টাকা আটকে দিয়ে পরবর্তী দুই বছরের জন্যে সরকারি কোনো কাজ আমরা পাবো না বলে জানানো হয়। কোম্পানির বোর্ড মিটিঙে বন্ধুরা মুখ কালো করে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে, যেহেতু কাজটার যাবতীয় দায়িত্ব আমার ছিলো। সরকারি অফিসের মতো এখানেও কেউ কোনো ব্যাখ্যা শুনতে রাজি নয়। অজুহাতে ক্ষতিপূরণ হয় না।

সুতরাং বন্ধুরা অবিলম্বে বিশুদ্ধ ব্যবসার পার্টনারের মুখ বানিয়ে ফেলে। দোস্ত্ দোস্ত্ না রাহা...

কষ্ট হলেও একসময় মানতে হয়, বৈরি অবস্থার মধ্যে আর যাই হোক কাজ করা যায় না। কী করবো ঠিক না করেই তখন বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অন্যকিছু করা অসম্ভব ছিলো না, চেষ্টাচরিত্র

করলে নিজে অথবা আর দুই-একজন পার্টনার নিয়ে প্রেসের ব্যবসায়ই থাকা যেতো। হলো না। আমার পুঁজিসহ প্রাপ্য টাকাপয়সা পাওয়া যায় দফায় দফায় দশ-বিশ-পঞ্চাশ হাজার করে। কোর্টকাচারি করার কথা মনে হয়নি কখনো, তা নয়। যাদের এককালে বন্ধু জেনেছি তারা আমাকে বন্ধু আর না-ও ভাবতে পারে, কিন্তু তাদের আদালতে তোলার রুচি আমার হয়নি। আর তখন টাকাপয়সার যা অবস্থা, তাতে মামলা করলে যে টাকা অনিয়মিতভাবে হলেও তখন আসছিলো, তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যেতো। ওই টাকায় তখন আমার পরিবার চলে।

অন্য বন্ধুবান্ধবের কাছে ধারকর্জ করে অল্প পুঁজিতে ছোটোখাটো কিছু করার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। লাভের মধ্যে লাভ, ধারের বোঝা, যা আমার জীবনে আগে কখনো নিতে হয়নি। সময়মতো ধারের টাকা শোধ না করতে পেরে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিলো। একবার পা পিছলে গেলে যা হয়, তাল সামলাতে গিয়ে হাতের কাছে যে কোনোকিছু ধরে ফেলার চেষ্টায় আরো ভাঙাচোরা করা এবং পরিশেষে নিজে চিৎপটাং হওয়া। পতনটা আমার এইভাবেই আসে।

একটা জিনিস বন্ধুদের কাছে তখন আমার শেখা হলো, অর্থনীতি পুরুষের আসল পরিচয়। অর্থনীতির সু অথবা কুস্বাস্থ্য সমাজে তোমার স্থান ও প্রতিপত্তি নির্ধারণ করবে, এটা পুরনো কথা। কিন্তু বন্ধুত্ব সম্পর্কে অবশ্য অন্য ধারণা নিয়ে আমি বড়ো হয়েছি। মনে পড়ে বাবা বলতেন, একদিনের বন্ধু তার ভালোমন্দ সব নিয়েই চিরদিনের বন্ধু। দিন পালটেছে, হয়তো সে কথাও এখন বাসি। জীবন হয়তো কখনোই সম্পূর্ণ হয় না। যখন অর্থ ছিলো, জীবন খুব অর্থময় হয়নি। যখন ভুল শোধরাতে চাইলাম, তখন এলো অর্থসংকট। সবারই এরকম হয়?

আমার বড়ো অনুশোচনা, নীলা অভিমান করে তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস গান ছেড়ে দিলো। কর্মক্ষেত্রে দংশন খাওয়া পুরুষ মানুষের আত্মবিশ্বাস খুব ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। তখন খুব সহজে ভয়ংকর, হিংস্র ও সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠে তারা। যেখানে কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয়, সেখানেও প্রশ্ন উৎপন্ন করার উপায় খুঁজে পায়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিলো। যা ঘটেছে, তা আর ফেরানোর উপায় নেই। অনুশোচনা নিয়ে যখন ভুল স্বীকার করতে গেলাম, তখন অনেক বিলম্ব ঘটে গেছে। নীলা সে বিষয়ে কোনো কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। একটু একটু করে দূরত্ব বাড়ে। ছোটোখাটো জিনিসে কথা কাটাকাটি হয়। ক্রমাগত কথার লড়াইয়ে ক্লান্ত হয়ে আমরা মৌনতায় আশ্রয় নিয়েছি। প্রয়োজন ছাড়া কথা বাহুল্য হয়ে গেছে।

এক বিছানায় এখনো ঘুমাই, হয়তো বাধ্য হয়েই। আরেকটা বাড়তি ঘর আমাদের থাকলে কী হতো বলা যায় না। বিছানায় দু'জনের মাঝখানে ঘুমায় বড়ো একটা কোলবালিশ, সীমানা ভাগাভাগি করে। ঘুমের ভেতরে সীমান্ত অতিক্রম ও লঙ্ঘন কোনো কোনো রাতে ঘটে, তখন কোলবালিশ সরিয়ে নো-ম্যান'স ল্যান্ডে মিলিত হওয়া। তা শুধুই শরীরঘটিত, প্রাণের টান নেই। দুই দেশের সীমান্ত-রক্ষীদের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিঙে মিলিত হওয়ার মতো। সম্পন্ন হলে একটিও কথা খরচ না করে যে যার এলাকায় ফিরে যাই, সীমান্তরেখা তখন আবার বাস্তব।

আমার দুর্বলতার জায়গাগুলি নীলা ঠিক জানে এবং সেই ক্ষতগুলিকে সে শুকাতে দেয় না। কর্মস্থলে আমার দুর্ভাগ্য ও টাকাপয়সার বিপর্যয়। এককালের সচ্ছল জীবনের জায়গায় আজকের অকিঞ্চিৎকর জীবনের গ্লানি এবং তার সম্পূর্ণ দায় যে আমার, তা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে? নীলার মুখে আমার অক্ষমতার কথা শোনার কষ্ট আলাদা। রিনির সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ও তার পেছনের কাহিনীও চলে

আসে। হয়তো প্রতিশোধ। রিনি সম্পর্কে নীলার কোনো ঈর্ষা আছে বলে মনে হয় না। থাকার কারণও নেই। সাজিদের সঙ্গে তার বার দুয়েক দেখা হয়েছে সে ঢাকায় এলে। নীলা তার সঙ্গে যথেষ্ট সহজ ছিলো। সাজিদ একবার জিজ্ঞেস করেছিলো, আচ্ছা তোমাকে আমি কী বলে ডাকবো?

নীলা হেসে ফেলেছিলো। কী বলে ডাকতে ইচ্ছে করে তোমার?

তা তো জানি না।

নীলা তখনো হাসছে, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করলে পারতে।

আগে ভাবিনি।

তাহলে আমিই না হয় ঠিক করে দিই। আমাকে তুমি ছোটো-মা বলবে।

সাজিদ মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ে, বাবার মতো?

আমার সঙ্গে বাবার এবং সাজিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একই সমান্তরাল, ছোটো মা-র সঙ্গে আমার এবং সাজিদের সঙ্গে নীলার। আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম, আগে কখনো খেয়াল করিনি, সাজিদ করেছে। এর নাম জীবনপ্রবাহ? পরম্পরা?

পরশু সাজিদ ফোন করে আসার খবর জানানোর পর একটা কথা আচমকা জিজ্ঞেস করেছিলো, বাবা আমি যে আসছি, তোমার আপত্তি নেই তো?

তুই আসছিস, আমার আপত্তি থাকবে কেন?

সেরকম আপত্তির কথা বলতে চাইনি। এবার তো ঠিক বেড়াতে আসা নয়। বলতে গেলে তোমার সঙ্গে আমার নতুন করে পরিচয় হবে, সম্পর্ক গড়তে হবে, একটা বোঝাপড়া দরকার হবে। তুমি যে সাজিদকে দেখেছো, সে আর সেই ছোটোবেলার সাজিদ নয়। আর যে বাবাকে আমি চিনতাম, তুমিও সেই বাবা নও। আমাদের জীবন পাল্টে গেছে। আসলে ভাবছিলাম, তোমার সঙ্গে সেই বোঝাপড়াটা হবে তো? আমরা পরস্পরকে সহ্য করতে পারবো কি না, ভালোবাসতে পারবো কিনা তাই ভাবি।

পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মতো কথা বলে সাজিদ। সত্যিই তো, এই সাজিদকে আমি কতোটুকু জানি? সে-ই বা আমাকে কতোটুকু বুঝবে? যখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম, তখন সে শিশু। আজ এতো বছর পরে পুনর্মিলনের সময় সে যদি কৈফিয়ত দাবি করে বসে, কোন দোষে ওই বয়সে প্রিয় পিতার সঙ্গ থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয়েছিলো? কী জবাব আছে আমার? যদি থাকে এবং খুব যুক্তিসঙ্গতও হয়, সাজিদ তা মানবে কেন? তার বা আমার এই অনিশ্চয়তার বোধের মধ্যে খুব পার্থক্য নেই।

একটা সময়ে সংকটে পড়লে মনে হতো, উপায় একটা হয়ে যাবে। কোনোকিছু আটকে থাকে না। আমার সেই বিশ্বাস আর নেই, বয়স ও অভিজ্ঞতায় তা জীর্ণ-মলিন, টুটা-ফাটা। যে কোনো সংকটকেই অনেক বড়ো ও অলঙ্ঘনীয় লাগে। তবু যা অনিবার্য, তার মুখোমুখি হতেই হয়, না হয়ে উপায় থাকে না।

এইসময় বাবা দেশে থাকলেও একটা ব্যবস্থা সহজেই হতে পারতো। দাদার বাসায় উঠতে সাজিদের অসুবিধা হতো না। কিন্তু অবসরের পরে বাবা এখন চুক্তিতে একটা কনসালটিং-এর কাজ করছেন থাইল্যান্ডে। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শেষ করে চাকরি-বাকরিতে ঢুকে গেছে, সুখী আমেরিকায়, সুমন অস্ট্রেলিয়ায়। বাবার কনসালটিং-এর মেয়াদ শেষ হতে আরো বছরখানেক, তারপর স্থায়ীভাবে দেশে ফেরার ইচ্ছে। তাতে সাজিদকে নিয়ে আমার এখনকার সংকটের কোনো সুরাহা হচ্ছে না।

বাসায় ফিরে দেখি, নীলা রান্নাঘরে বাজারের ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করছে। ঋষিকে স্কুলে নামিয়ে বাজার সেরে ফিরেছে। বাসায় আছি, বাজারটা আজ আমিই করতে পারতাম। সওদাপাতি গুছিয়ে মাছ কাটতে বসে যায়। ইলিশ আমার পছন্দের মাছ, আমি বাসায় আছি বলে এনেছে? ঘরে যাই। কাপড় বদলে বসার ঘরে সোফায় বসি। উঠে আবার রান্নাঘরে। অস্থির লাগে। কীভাবে কথা শুরু করা যায়?

নীলা চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবে?

টের পায় কী করে? বলি, হ্যাঁ। একটু কথা ছিলো।

তুমি ওদিকে গিয়ে বসো, মাছ কোটা শেষ করে আসছি।

শোয়ার ঘরে বিছানায় গা এলিয়ে দিই। বাসায় দুইজনে সম্পূর্ণ একা। কতোদিন পরে। কোনো একটা বাসনা জেগে উঠতে চায়। কিন্তু সাজিদ আমার মাথার পুরো দখল নিয়ে বসে আছে।

নীলা এক কাপ চা নিয়ে ঘরে আসে। চা দিতে বলেছিলাম নাকি? মনে পড়ছে না। উঠে বসি। বেডসাইড টেবিলে কাপ নামিয়ে রেখে নীলা বলে, কী বলবে বলো।

আচমকা তার হাত ধরি। টেনে পাশে বসিয়ে চুমু খাই। নীলার হাত আমার কাঁধের ওপর উঠে আসে। আমার দুই হাত ব্যস্ত হয়ে ওঠার সময় পায় না। উঠে দাঁড়িয়েছে নীলা।

আমার সারা গায়ে মাছের গন্ধ। তুমি চা শেষ করো, আমি চট করে গোসল সেরে নিই।

একটু দূরত্বে, হয়তো নিরাপদ দূরত্বে, দাঁড়িয়ে শরীর থেকে শাড়ি নামিয়ে ফেলে নীলা। তার মুখে মৃদু হাসি, কিছু রহস্যমাখা। হয়তো ততো রহস্যময়ও নয়, এই ঠোঁটচাপা হাসি আমার চেনা। পরনের অবশিষ্ট সব বস্ত্র ও বস্ত্রখণ্ড একে একে তার পায়ের কাছে মেঝেতে জায়গা পায়। চোখভরা তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে আমিও হাসি, হাত তুলে ইশারায় কাছে আসতে বলি। হাস্যে-লাস্যে মাথা ঝাঁকায় সে, চকিত পায়ে বাথরুমে অন্তর্হিত হয়। প্রায় বিশ বছরের পুরনো স্ত্রীকে এখন আবার বউ-বউ লাগে।

ধুলিমলিন জীবনের ক্লিন্নতা তবু ভোলা হয় না। এই আমার সংকটের সমাধান? হয়তো। হয়তো নয়। কে জানে!

নিশি

বাবাকে একা পাওয়া যাচ্ছে না ক'দিন ধরে। আজও সকালে অন্যমনস্ক মুখে বেরিয়ে গেলো দেখলাম। সাজিদ ভাইয়ার আসা নিয়ে মা-র সঙ্গে কী কথা হলো জানি না। মায়ের মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। এখনো জানে বলে মনে হচ্ছে না। তাহলে? বলেনি এখনো? আর কবে বলবে? বাবা যে তারিখ বলেছিলো, সেই হিসেবে আর ঠিক ছয় দিন বাকি থাকার কথা। কী ব্যবস্থা হচ্ছে কে জানে!

হয়তো আমার মাথাব্যথা নয়। তবু মাথাব্যথা বটে। বাবার হয়তো সবচেয়ে বেশি। তাহলে আমার নয় কেন? মায়েরও কিছু। তাহলে আমার নয় কেন?

এক হিসেবে ধরতে গেলে সাজিদ ভাইয়া আমার কেউ নয়। সে হিসেবটা ঠিক মনে হয় না। বাবার পুত্র হিসেবে সে আমার ভাই না তো কী? আলাদা বাবা বা মায়ের হয়েও সৎ ভাইবোনরা অনেক সময় একসঙ্গে বেড়ে ওঠে। সাজিদ ভাইয়ারও এক সৎ বোন আছে শুনেছি, তাদের বাবা-মা কেউ তাদের

মিলিয়ে দেয় না। রক্তের যোগাযোগ নেই, অন্য কোথাও তাদের শুরু হয়েছিলো, পরে এসে তারা এক ছাদের নিচে মানুষ।

সেদিক থেকে আমি আর সাজিদ ভাইয়া বরং অনেক কাছের। মা আলাদা হলেও বাবা আমাদের মিলিয়ে দেয় কোথাও। আমরা দু'জন পৃথিবীর দুই প্রান্তে বড়ো হয়ে উঠেছি, তবু সে আমার ভাই-ই। সাজিদ ভাইয়ার মাকে আমি কখনো চাক্ষুষ দেখিনি, পুরনো অ্যালবামে ছবি দেখেছি। মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দু'জনকেই সমান সুন্দর লাগে। তার সঙ্গে কখনো দেখা হলে তাকে আমি কী সম্বোধন করবো? সাজিদ ভাইয়ার এই সমস্যা হচ্ছিলো আমার মায়ের সঙ্গে, মা তাকে বলে দিয়েছিলেন ছোটো মা ডাকতে। সাজিদ ভাইয়ার মা কী তাহলে আমার বড়ো মা?

এইসব সম্পর্ক-টম্পর্কগুলো মাঝে মাঝে জট পাকিয়ে যায়, গোলমেলে লাগে। মায়ের দিকের কোনো আত্মীয়-স্বজনকে কখনো দেখা হয়নি। তার এক বোন দেশে থাকতে মাঝেমধ্যে নাকি আসতেন, আমি ছোটো ছিলাম, মনেও পড়ে না। বাপমায়ের সঙ্গে মাকে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়েছিলো বাবাকে বিয়ে করার কারণে। তাদের দেখা আমি কোনোকালে পেলাম না।

বাবার দিকেও এরকম গোলমাল আছে। দাদা-দাদীর সঙ্গে আমার এবং ঋষির সম্পর্ক খুবই ভালো। আমাদের জন্যে তাঁদের ভালোবাসার কমতি নেই, সব ভালোমন্দের খোঁজখবর রাখেন। জন্মদিনে ফোন করেন, এসএমএস করেন। দেশে এলে কতোরকমের দরকারি-অদরকারি জিনিস আনেন। তবু কোথাও যেন কিছু অপূর্ণ লাগে। হয়তো সেখানেও ভালোবাসার ভাগাভাগি থাকে বলে।

বাবা-মায়ের জানার কথা নয় যে সাজিদ ভাই আসছে, আমাদের সঙ্গে থাকবে জেনে আমার একটা গোপন খুশি আছে। কবে থেকে মনে নেই, কেন তা-ও জানি না, তবু সবসময় মনে হয়, আমার যদি বড়ো ভাই থাকতো! বড়ো একজন ভাই থাকলে কী হয়, কী কাজে লাগে আমার সে অভিজ্ঞতা নেই। চাওয়াটা সত্যি, এখন তা পূর্ণ হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এক ধরনের সংশয় যে নেই, তা-ও বলি কী করে? কতোটুকু চিনি আমার এই দূরে থাকা ভাইকে? আগে যখন দেখা হয়েছে, সবই অল্প সময়ের জন্যে। স্বল্পকালের অতিথির মতো এসেছে, দেখা-সাক্ষাত, সামান্য কথাবার্তা এই পর্যন্ত। ফিরে গেছে তার নানার বাসায়, তারপর সময় হলে দূরদেশে নিজের ঠিকানায়। অল্প পরিচয়ের ভাইটি ঠিক ঠিক ভাই হয়ে উঠবে তো? তাকে তেমন করে চিনি না, তার পছন্দ-অপছন্দ জানি না। যদি তাকে আমার ভালো না লাগে? বা আমাকে তার?

বাবা-মায়ের কাছ থেকে কোনো সংকেত পাওয়া যাচ্ছে না বলে কিছু উদ্বেগ হয়। তাহলে কী সাজিদ ভাইয়া আসছে না? মায়ের অনুমোদন পাওয়া যায়নি? মা সম্মত না হলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। দুই কামরার এই বাসায় আমাদের কোনোমতে থাকা, বাবা-মায়ের মধ্যে সহজ একটা বোঝাপড়া থাকলেও না হয় কথা ছিলো। তা যে নেই, চোখকান জায়গামতো থাকলে বুঝতে কারো সময় লাগার কথা নয়। সুতরাং হঠাৎ একজন কেউ এসে উপস্থিত হলে অপ্রস্তুত লাগবে, তা-ই স্বাভাবিক। দুয়েকদিনের মামলা হলে তবু কোনোমতে ঢেকেঢুকে রেখে পার করে দেওয়া যায়। বাবার হাতে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আছে বলেও মনে হয় না। কোত্থেকে থাকবে? আগের দিন আর আমাদের নেই, থাকলে সমস্যা ছিলো না। ভয় হয়, এই নিয়ে আবার মা-বাবার মধ্যে নতুন কোনো জট না লেগে যায়।

আজ দুপুরে শ্যামলীতে মেহরীনদের বাসায় যাবো। সব বন্ধুরা আসবে সেখানে। ইরফান লন্ডনে চলে যাচ্ছে পড়তে। উপায় থাকলে ওর মতো মেধাবী ছেলেরা এ দেশে থাকে না। একদিন সে যাবে, আমরা সবাই জানতাম। দিনতারিখ জানা ছিলো না, এখন তা-ও ঠিক হয়ে গেছে। সামনের রোববার। আজ তার বিদায় উপলক্ষে সবাই একত্রিত হওয়া। কিছু হাসিঠাট্টা, রঙ্গ-রসিকতা এইসব হবে আর কি। বিপদ একটাই, রান্না করবেন মেহরীনের মা নিজে। আমাদের এই খালাম্মা অল্পস্বল্প রান্না করতে জানেন না, কম করে হলেও দশটা পদ থাকবে। খাওয়ার সময় নিজে তদারক করবেন, সবগুলো পদ নিজে পাতে পাতে তুলে দেবেন। সেটা যে একরকম নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে তা বোঝানোর উপায় নেই।

আমার পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে যায়, সবাই এসে পড়েছে দেখতে পাই। বরাদ্দ সম্ভাষণ আসে হিমেলের মুখ থেকে, এই যে মিস লেট লতিফা এসে গেছেন। বাচ্চালোগ তালিয়া বাজাও।

একটা হাসির রোল ওঠে। কীভাবে কে জানে, সবখানে আমার সময়মতো পৌঁছানো হয় না। ইচ্ছাকৃত নয়, যতো চেষ্টা করি ঠিক সময়ে যাবো, কিছুতেই হয় না। ছেলেদের বরাদ্দ লেট লতিফ কথাটা আমার জন্যে হয়েছে লেট লতিফা। গায়ে মাখি না, অভ্যাস হয়ে গেছে।

মেহরীন বলে, ও দেরিতে এলো বলে হাসাহাসি করতে পারলি, সময়মতো এসে পড়লে হতো?

ইরফান সুর করে গায়, নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে, চুপি চুপি বাঁশি বাজে বাতাসে।

পিংকি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, এঃ, কী গানের ছিরি। এইসব কারা গাইতো বল তো? শোনে কে?

ইরফান বলে, আমাদের পিতামাতা ও পূর্বপুরুষরা। ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে, আমি বনফুল গো শুনেছিস? শুনলে অজ্ঞান হয়ে যাবি। আমার দাদা পুরনো গ্রামোফোনে এখনো বাজায়।

মিতালি বলে, তোর গোছগাছ কতোদূর হলো রে?

ওঃ সে আরেক কাহিনী। আমার মা তো পারলে পুরো বাংলাদেশটাই সঙ্গে বেঁধে দেয়। সারাক্ষণ শুধু বলছে, এটা নিবি না, ওটা নিবি না? এই করে করে আমার ঘরে যতো জিনিস জড়ো করেছে, সব নিতে হলে গোটা একটা কার্গো প্লেন ভাড়া করতে হবে।

এই না হলে মা? মেহরীন টিপ্পনি কাটে।

জানিস, কাল মা একটা প্যাকেটে করে সুঁই-সূতা এনে বলে, এটা সঙ্গে নিতে ভুলিস না। আমি বলি, এটা দিয়ে কী করবো? মা বলে, শার্টের বোতাম-টোতাম ছিঁড়ে গেলে লাগাতে হবে না?

হিমেল গম্ভীর মুখ করে বলে, ঠিকই তো। তখন কী করবি?

হিন্দি সিনেমার নায়কের কায়দায় বলবো, বাটন তো কেয়া, মেরা জিন্দেগি হি তো টুট গ্যয়া।

আবার তুমুল হাসি। মেহরীন হাসি সামলে বলে, তুই পারিসও। পাস কোথায় এসব?

আমাদের দলে একজন রেসিডেন্ট কবি আছে, সাব্বির আহসান। আমরা সভাকবিও বলি। সে এবার বলে, আচ্ছা আমরা কি ইরফানকে ফেয়ারওয়েল দিচ্ছি, নাকি বিয়ে করাতে নিয়ে যাচ্ছি? আমাদের একটু দুঃখ-দুঃখ মুখ করে একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করা দরকার না?

আমি বলি, একদম ঠিক কথা। এতো হাসিঠাট্টা ঠিক হচ্ছে না।

সাব্বির বলে, কিছুদিন আগে একটা পুরনো বাংলা উপন্যাস পড়ছিলাম। এক বন্ধু বিদেশে চলে যাবে, তাকে বিদায় দিতে গিয়ে আরেক বন্ধু কেঁদে অস্থির। এমন হাসি পায়! মনে হয়, অন্য কোনে গ্রহের কাহিনী পড়ছি। দু'জনই কিন্তু পুরুষ।

কেউ একজন ফোড়ন কাটে, গে নাকি?

হাসির হল্লা ওঠে আরেকবার। সাব্বির বলে, শরৎচন্দ্রের নায়িকাগুলো তো মনে হয় হেভি ডিউটি তোয়ালে ব্যবহার করতো। কথায় কথায় এতো ফ্যাঁত ফ্যাঁত করে কাঁদে, রুমালে কাজ হওয়ার কথা নয়।

ইরফান বলে, তাহলে তোরা কেউ আমার জন্যে একটু কাঁদবি না?

আমি বলি, অতো শস্তা পেয়েছিস? এই যুগের ছেলেমেয়ে আমরা, অতো সেন্টিমেন্টাল নই।

মেহরীন সায় দেয়, আজকের দিনে ওরকম হলে চলে না।

আমি এবার বলি, ইরফান তোর প্লুটো-রিসার্চের কী হলো? সবাইকে বলেছিস?

সাব্বির বলে, বলেনি আবার? কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। শালা গেলে বাঁচি, প্লুটো কোথাকার।

হিমেল মন্তব্য করে, ভালো গালি আবিষ্কার করেছিস তো, প্লুটো কোথাকার!

ইরফান বলে, আমার ফেয়ারওয়েলে তোদের মানপত্র পাঠ করার কথা। তা তো করলিই না, আমার পেছনে লেগে গেলি। ঠিক আছে, আমিই জাত-যাওয়া প্লুটোকে নিয়ে একটা মানপত্র পড়ি।

মনে হয় সে তৈরি হয়েই এসেছিলো। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বলে, ইন্টারনেট থেকে প্রিন্ট করে নিয়েছি। শোন।

ইরফান পড়তে থাকে, "... বিস্ময়-অব্যয়ের গোটা অভিধান ধামসেও এ অবিচারের ঠিকঠাক হাহাকার বোঝাতে পারবে না বস। প্লুটোর হাতও নেই যে মাথার চুল ছিঁড়বে। মাথায় চুলও নেই অবশ্য। কিন্তু এ কী ধরনের ইল্লুতে কারবার! একটা নিপাট ভদ্রলোক নির্বিবাদী গ্রহ, সূর্যের চেয়ে যোজন যোজন লাজুক দূরত্বে একেবারে ঘাড় নিচু করে রুটিন-মাফিক স্পিন খেয়ে যাচ্ছে, যদ্দিন বলবে হাত কচলে নখ রগড়ে মিনমিনিয়ে ঘুরঘুর করে যাবে, কেউ বলতে পারবে না ছিয়াত্তর বছরে একটি দিনও অ্যাবসেন্ট হয়েছে বা আস্তে কোমর ঘোরাচ্ছিল বা আহ্নিকের সময় বিড়ি ফোঁকে – তাকে স্রেফ কতকগুলো হুমদো লোক একটা সেমিনারের ঘরে বসে কী সব অংবং বকে, গ্রহের আসন থেকে ঝট করে নামিয়ে দিলে! 'অ্যাই ব্যাটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউ অ্যাট দ্য ব্যাক, কাল থেকে তুই বামন গ্রহ।' তার মানে? কোনও ব্যাকিং নেই বলে কি যাচ্ছেতাই করবে? কে বামন? যখন সাধ করে চাঁদা দিয়ে সৌরমণ্ডল এঁকে বালকবৃন্দের টেক্সট বইয়ে বিলি করেছিলে, তখন মনে ছিল না? যখন যুগ যুগ ধরে কোশ্চেন পেপারে 'হাউ মেনি প্ল্যানেটস আর দেয়ার ইন দ্য সোলার সিস্টেম' ছেপে গোঁপ পাকিয়ে গার্ড দিচ্ছিলে, তখন মনে ছিল না? প্লুটো কি তোমাদের পায়ে ধরে সাধতে গেছিল যে, বাপ আমার, আপিসটাইমে ভাত জুটছে না, আমায় একটা গ্রহের স্টেটাস দে! সে দিব্যি আপনমনে খেলছে, থাকছে যেন বা মহাশূন্যে গড়গড়ানো আত্মভোলা মার্বেল, কালের কপোলতলে কুচো ক্যাম্বিস বল, আবহাওয়াটাও এয়ারকন্ডিশন করে রেখেছে যাতে আরামে গা জুড়িয়ে আসে, মোদ্দাকথা, 'আমি তোমার নিতম্বে লাগছি না তাই তুমিও আমার নিতম্বে লেগো না'-সূচক প্রচণ্ড শিষ্ট ও শালীন ভাবধারা সমন্বিত নিশ্চিন্দিময় জীবন বিতাচ্ছে। হেনকালে তুমি হেব্বি পাওয়ারের টেলিস্কোপ ফেলিস্কোপ দিয়ে রাতদুপুরে কী দেখলে না দেখলে, আচমকা নিজের ক্যালি বিকশিত করার জন্য তাকে

নামধাম দিয়ে গ্রহের শিবিরে ভর্তি করে নিলে। যে, কী কাণ্ডটাই কল্লুম, ফের একটি গ্রহ পেড়েছি। এ বার যখন সে শিরোপাটি হজম করে মনে মনে নিজেকে এই সৌরজগতের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ভাবতে শিখে গেছে, কালের নিয়মে ঘেমো কলারটিও উঁচু হয়েছে পোয়াটাক, পাশ দিয়ে ইনস্যাট স্যাটাস্যাটের হাই-হ্যালোকে আড়ে চেয়েও দেখে না, বরং বলতে নেই নধর সেক্রেটারিও হয়েছে একটি, তার নাম শ্যারন, কাজ বলতে হ্যাঁ স্যর, হ্যাঁ স্যর বলতে বলতে বসকে প্রদক্ষিণ (প্র-উত্তরও বলা যেতে পারে, কারণ সব প্রশ্নের উত্তরই প্রো-প্লুটো) তখন আচমকা বিনা স্কাইল্যাবে ঘাড়ে টিন পড়ার মতন, ভারিক্কি চাড্ডি লোক খেয়ালখুশির বশে সুমহান রদ্দা মেরে তার মেডেলটি ছিঁড়ে নিলে! যে, যা এবার চরে খা। কেন? না, আমাদিগের ভোটাভুটি হয়েছে। বাহবা রে গণতন্ত্রের মহিমে। তা হলে এবার থেকে এরকমটাই চলবে তো? লোকজন একটা করে সেমিনার বাগাবে, ভাল কেটারারের দেওয়া লাঞ্চের পর হেউহেউ করে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে দুটি দুর্বোধ্য বাক্য আউড়ে যে যার রসুনগন্ধী ডান হস্ত তুলে ভোট-টোট দিয়ে সিদ্ধান্ত লিয়ে লেবে কে অদ্য হইতে বামন? এক দিনের খচাৎ সইয়ে ছাঁটাই হয়ে যাবে মেগাস্টার? এ তাহলে সাপলুডোর বাস্তব গেম? কেউ জানে না কবে কোথায় গণতন্ত্রের সাপ ওৎ পেতে আছে, তুমি দিব্য উড়ছ, চকিতে কোঁৎ, ব্যস সিধে নিম্নন্যাজের তলায়! ...”

উঃ পারেও বটে, পাগল একটা।

সাব্বির না থামালে আরো কতোক্ষণ মানপত্র পাঠ চলতো বলা যায় না। সে হাত তুলে গম্ভীর মুখে বলে, ইরফান, আমার মনে হয় লন্ডনে গিয়ে তোর প্রথম কাজ হবে মাথার নাটবল্টুগুলো চেক করানো।

ইরফান হেসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই খাওয়ার টেবিলে ডাক পড়ে। যা ভাবা গিয়েছিলো তাই। পুরো টেবিল খাবারে খাবারময়, প্লেট রেখে বসে খাওয়ার জায়গাও খালি রাখা হয়নি।

মিতালি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, সব খেতে হবে?

খালাম্মা হাসিমুখে বলেন, তাহলে কি শুধু দেখার জন্যে? আমি লাঠি নিয়ে এসে পাহারায় বসছি, দেখি কে না খেয়ে পালায়।

হিমেল ফোড়ন কাটে, খালাম্মা এই পরিমাণ খাবার দিয়ে সোমালিয়ায় একটা পুরো শহরকে বাঁচানো যায়। তার চেয়ে পুলিশ ডেকে আমাদের সবাইকে ধরিয়ে দিলে হয় না?

আমরা প্লেটে খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাই। ঘুরে ঘুরে টুকটাক কথা চলে। এক ফাঁকে ইরফান আমার পাশে চলে আসে। নিচু গলায় বলে, তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

বলে ফেললেই পারিস।

এখানে হবে না। একা বলতে হবে।

খাওয়া শেষ হলে হলঘরে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। ধূমপায়ী ইরফান আর সাব্বির বারান্দায় চলে যায়। সাব্বির ফিরে এসে বলে, নিশি তোকে ইরফান বাইরে ডাকছে।

অস্বাভাবিক কিছু নয়, কেউ কিছু ভাববে না। হয়তো খেয়ালও করবে না।

বারান্দায় গিয়ে দেখি ইরফান আরেকটা সিগারেট ধরাচ্ছে।

কী বলবি, বল।

ইরফান উদাস চোখে সামনের দিকে তাকায়। বলে, যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে আর টের পাচ্ছি, তোকে আমি খুব মিস করবো।

এই কথা বলার জন্যে তুই আমাকে আলাদা ডেকে আনলি?

এবার আমার চোখে চোখ রাখে সে। বলে, হ্যাঁ। বলেছি, তোকে খুব মিস করবো, তোদের সবার কথা কিন্তু বলিনি। সেটা সবার সামনেই বলা যায়।

তাতে কী হলো? আমিও করবো। পাঠান, পাঁঠা আর পাগল সবগুলো ইরফানকেই মিস করবো।

ইরফান হাসে। এতো সুন্দর করে সে হাসতে পারে, কোনোদিন খেয়াল করিনি। বলে, ঠাট্টা নয়। আমি কিন্তু তোর জন্যেই ফিরে আসবো।

একটু চুপ করে থেকে বলে, তুই কি বুঝতে পারছিস পাগলি?

আমি নিশ্চুপ থাকি। মনে মনে বলি, বলিস না ইরফান। আমার খুব ভয় লাগে। চোখের সামনে যা প্রতিদিন দেখি, তাতে আমার আর কিছুই বিশ্বাস হয় না। ভালোবাসাশূন্য একটা সংসার কীভাবে দিনের পর দিন বোঝার মতো বয়ে বেড়ায় আমার বাবা-মা। তারা ভালোবেসে সংসার পেতেছিলো, তার কিছুই আর আজ অবশিষ্ট দেখতে পাই না। তুই প্লুটোর কথা বলছিলি। আমার কাছে বাবা-মার অবস্থা প্লুটোর মতো। তারা নিজেদের জায়গায় আছে এখনো, এককালের গ্রহ, শুধু কৌলীন্য খোয়া গেছে। তুই আমাকে যা বলতে চাস, আমি খুব বুঝি। ভাবিস না আমিও একই কথা তোকে বলতে চাই না। তোর কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে, আরো হাজারবার লক্ষবার শুনতে ইচ্ছে করছে। তবু বলি, বিশ্বাস করতে ভয় হয়। আমার নিজেরও বলতে সংকোচ লাগে। কারণ, সংশয় নিয়ে বললে তা খুব ফাঁপা আর অর্থহীন শোনাবে। এই বয়সে আমার এতোকিছু জানার কথা ছিলো না ইরফান, দরকারও কি ছিলো? সুতরাং কোনো প্রতিজ্ঞা নয়, ইরফান, কোনো প্রতিশ্রুতি নয়। জীবন বদলায়, খুব দ্রুতই বদলায়। একদিন সময় বলে দেবে তুই কোথায় থাকবি বা আমি কোথায়। তখন যদি আমরা আবার কখনো এক জায়গায় মিলিত হই, এই তুই আর এই আমি কি তখনো এইরকম করে একই কথা বলতে পারবো, না চাইবো? আমি জানি না। তোরও জানা নেই। থাক এইটুকু রহস্য, অমীমাংসিত হৃদয়-বৃত্তান্ত। যদি কখনো আর দেখা না হয়, কোনোদিন জানবি না, তুই আমার জীবনে প্লুটো হয়েই থাকবি। একটা গ্রহ, যেখানে তোকে জায়গা করে দিয়েছি, সেখানে তুই অনড় অক্ষয়। বাইরের কারো সিদ্ধান্তে কিছু বদল হবে না, তুই আমার প্লুটো। কতোদূরে চলে যাবি, তখন দূর থেকে দেখবো, হয়তো খালি চোখে দেখাও যাবে না। তবু আমি ঠিক জানবো, দেখতে পাবো।

এইসব ভাবতে চোখ ভিজে ওঠে কেন কে জানে! এইসব সেন্টিমেন্টের কোনো মানে হয়? আমরা না নতুন কালের মানুষ!